

ব্রহ্ম-বিহার

(মৈত্রী-করুণা-মুদ্রিতা-উপেক্ষা)

শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের

পালি বুক সোসাইটি
বাংলাদেশ



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

NAMO AMITABHA

看破放下自在隨緣念佛



真誠清淨平等正覺慈悲

ব্রহ্ম-বিহার

(মৈত্রী-কৰুণা-মুদিতা-উপেক্ষা)

শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের

পালি বুক সোসাইটি
বাংলাদেশ

সোসাইটি সিরিজ নং-৯

প্রকাশনায় : পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল : ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯

প্রাপ্তিস্থান : পালি বুক সোসাইটি বাংলাদেশ

১২, হেম সেন লেইন, চট্টগ্রাম।

এবং

অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী

বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধ মন্দির সড়ক, চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদে : বুদ্ধমূর্তি চীনের কাংসু প্রদেশের মাহচিশানে ১৩৫ নং
গুহার প্রাপ্ত (৩৮৫-৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরাঞ্চলীয় উয়েই
রাজত্বকালে নির্মিত)। শ্রী বিজয়শ্রী বড়ুয়ার সৌজন্যে।

মূল্য : শোভন—দশ টাকা

স্বল্পভ—সাত টাকা

মুদ্রণে : চেম্বার প্রেস

৫০, সদরঘাট সড়ক, চট্টগ্রাম।

**Dedicated to
the long life of
Most Venerable Nikkyo Niwano
the receipient of
Templeton Foundation Award—1979.**

মাননীয় নিকিও নিওয়ানো সভাপতি, রিশো কোশাই কাই



টেম্পেটন ফাউন্ডেশন জাপানের কিশো কোশাই কাই-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাননীয় নিকিও নিওয়ানোকে এ বছরের এওয়ার্ড দেন ২৯-১-৭৯ তারিখে বিলাতের উইন্ডসর প্রাসাদে ডিউক অব এডিনবার্গের মাধ্যমে। প্রতি বছর মানবতার সেবায় নিয়োজিত ধর্মীয় প্রচারকদের এই এওয়ার্ড দেওয়া হয়। এ দুর্লভ এওয়ার্ড যা বিশ্ববাসী ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের জন্য নোভেল প্রাইজ সমতুল্য মনে করে তা' পূর্ববর্তী বছরগুলিতে পেয়েছেন কলকাতার মাদার টেরেসা ও ফ্রাঙ্কের ব্রাদার রবার, যা' বাংলাদেশী টাকায় পঁচিশ লক্ষ টাকা। তিন হাজার বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্যে মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষু মাননীয় নিওয়ানোকে বিচারকমণ্ডলী মনোনীত করেন তাঁর দীর্ঘ মানবসেবা যার নিদর্শন পাওয়া যায় মহাবোধি সোসাইটির কলিকাতা অনাথালয়ে, স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে, ফিলিপাইন, লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে বিবেচনা করে।

মাননীয় নিওয়ানো ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জাপানের উত্তরাঞ্চলীয় গ্রাম সুগানায় জন্মগ্রহণ করেন। তুষারাময় গ্রামা জীবন শৈশবেই শিক্ষা দেয় "কঠোর পরিশ্রম, পরস্পর সহযোগিতা ও সহনশীলতাই মানবজাতির অগ্রগতির চাবিকাঠি"। পরবর্তীকালে ১৯৩৮ সালে এ মানসিকতাই তাঁকে উদ্ধুদ্ধ করে রিশো কোশাই কাই প্রতিষ্ঠা করতে। এ সংস্থার বর্তমান সদস্য পঞ্চাশ লক্ষ আট হাজার। তথাগত বুদ্ধের শান্তি, মৈত্রী, করুণার বাণী পুচার ও প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নততর সমাজ ও স্বাস্থ্য শান্তি প্রতিষ্ঠাই এ সংস্থার লক্ষ্য এবং স্লোগান "Build a Peaceful, Beautiful, Society Worth Working for."

মাননীয় নিওয়ানো একজন সুসংগঠকই নয় তিনি সুলেখকও বটে—তাঁর Lifetime Bigginer (আত্মজীবনী) The richer life, A Buddhist Approach to peace এবং Buddhism for to-day. লেখনী ও চিত্রা শক্তির পরিচয় গ্রহণ করে আর বহন করে শান্তির জন্য তাঁর পুণেষ্ঠার নিদর্শন।

শান্তি আমাদের ও কামা—তাই আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শান্তি পদক প্রাপ্ত মাননীয় জ্যোতিপাল মহাথেরোর বই তাঁকে উৎসর্গিত হলো। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

ভূমিকা

ব্রহ্মবিহার' প্রকাশিত হল। এ গ্রন্থটি ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভাগ করে নিপুণ গ্রন্থকার প্রত্যেক অধ্যায়ের নামানুসারে যথোচিত তাঁর সূচিত সুনীতি-পূর্ণ বিষয় সমূহ অতি শোভান-সুন্দর ভাষায় ও শৃঙ্খলায় পাণ্ডিত্য-বিলাসে সৌরভমণ্ডিত মনোরম পুষ্পমালার মত রচনা করেছেন। ইহা তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

রূপব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মাগণ মৈত্রী, করুণা, মৃদিতা ও উপেক্ষা পরায়ণ। এ চতুর্বিদ চেতনা সহস্রত অবস্থায় তাঁরা বিহরণ করেন, তাই এ পবিত্র গুণ-ধর্ম চতুষ্টয় 'ব্রহ্মবিহার' নামে আখ্যায়িত হয়। মানব সমাজে যারা ব্রহ্মার আচরিত এ গুণধর্ম চতুষ্টয় আচরণ করেন, তাঁদের ব্রহ্মচারী বলা হয়।

গ্রন্থকার মহোদয় গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'সূচনা'তে অতীত ও বর্তমান যুগের অবস্থা ক্ষোভমিশ্রিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—“বিশ্ব-সংসার তখন অবিদ্যার গাঢ় অন্ধকারে ছিল অন্ধ্রভূত, লোভ-দ্বेष-মোহে জর্জরিত, স্বার্থের হানাহানি, হিংসার উন্মত্ত, নিষ্ঠুর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ। ধর্মের নামে অজস্র প্রাণীহত্যা, যাগ-যজ্ঞ, নরবলী, সতীদাহ, আপন সন্তানকে স্বহস্তে গলায় বিসর্জন ইত্যাদি নিষ্ঠুর ক্রিয়াকাণ্ড। ধর্মের গোঁড়ামি-অজ্ঞতা বিমোদগার হয় মাত্র। সাম্য ও প্রেমের মহিমা কীর্তিত হয় বটে, কিন্তু বর্ণবৈষম্য ও ভেদ-বিভেদ পরিপূর্ণ... সে ক্ষেত্রে সাম্য ও প্রেমের তাৎপর্য কোথায়? সেখানে পবিত্র মৈত্রী-করুণার নিদর্শন কোথায়?”

গ্রন্থকার যা ব্যক্ত করলেন, বাস্তবিকই তা অন্ধরে অন্ধরে সত্য। অতীতের লোকেরা এতই মোহাক্ষ ছিল। তাদের আচরিত-উক্তনীতি চরম দুর্নীতি। নির্মম-লোমহর্ষকর এসব নীতি যদি ধর্ম হয়, তবে অধর্ম কা'কে বলে? .

গ্রন্থকারের লেখনীতে আরো ব্যক্ত হয়েছে—“বর্তমান যুগে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সভ্যতায় উন্নত হয়েছে। সে সঙ্গে চলছে আননিক বোমার শক্তি পরীক্ষা, মারণাস্ত্র আবিষ্কারের কঠোর সাধনা, মহাশূন্যে অভিযান এবং বেতার

যুদ্ধাদি কত শক্তিশালী যন্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে তার ঈয়ত্তা নেই, এতে শান্তি কোথায় ?”

গ্রন্থকার এ অধ্যায়ে বিবিধ যুক্তি উপমার মাধ্যমে অতিনিপুণতায় সহিত অতীত ও বর্তমান যুগের জড়ত্বগত ও মনোজগতের অবস্থা বুঝাবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পেয়েছেন।

মোহ অকুশলের মূল, অমোহ কুশলের প্রাণকেন্দ্র। মোহ—চিরন্তন সত্যকে আচ্ছন্ন করে রাখে, অমোহ—তা-উদ্‌ঘাটন করে প্রভাদীপ প্রজ্জ্বলিত করে। মোহ—কাম-ক্রোধ-মদ-মাৎস্যর্যের নব নব রূপদানে সূদক্ষ, অমোহ—এসবের তিরোধান করে, অধিকন্তু মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষার সঞ্চার ক’রে অমৃতময় পরাশান্তি আহরণ করে। ইহাই বৌদ্ধধর্মের অনন্যসাধারণ অবদান।

‘ব্রহ্মবিহার সাধনা’—গ্রন্থকার এ-অধ্যায়ে চতুর্ভুজ ব্রহ্মবিহারের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৈত্রী ধর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। ‘করনীয় মৈত্রী সূত্র’ হতে তিনি উপমা আহরণ করেছেন, যথা—“মাতা যথা নিমঃ পুত্রং আযুসা এক পুত্র মনুরক্কে ; এবমুপি সস্বভূতেসু মানসজাভঃ অপরিসমাং ।” ‘মাতা যেমন নিজের জীবন দিয়েও একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন, জগতের প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি তাদৃশ অপরিসমেন্ন মনোভাব উৎপন্ন করবে।’ এরূপ মৈত্রীই শ্রেষ্ঠতম বা অন্তিম মৈত্রী।

মৈত্রী ধর্মপরায়ণের প্রতি অস্ত্রক্ষেপণও ব্যর্থ হয়। শ্যামাবতী এর উজ্জল নিদর্শন। সতীসাক্ষী শ্যামাবতী কৌশাম্বিরাজ উদয়নের প্রধানা মহিষী। দ্বিতীয়া-রানী মাগন্ধিমা শ্যামাবতীর প্রতি বড় ঈর্ষা পরায়ণা ছিলেন। তাঁর কট্টচর্য্যে শ্যামাবতীর প্রতি রাজা এত ক্রুদ্ধ হলেন যে, তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে সহস্র বল সিংহধনু হস্তে নিয়ে টঙ্কার দিলেন। রাজার অবস্থা দেখে শ্যামাবতী সহচরীদের বললেন—“ভগ্নিগণ, তোমরা মহারাজ ও মাগন্ধিয়ার প্রতি মৈত্রী পোষণ কর, কারো প্রতি ক্রোধ করো না, একমাত্র মৈত্রী ও সাম্য ব্যতীত এখন আমাদের আর অন্য আশ্রয় নেই।”

রাজা শ্যামাবতীকে সম্মুখে রেখে পঞ্চশত সহচরীকে একজনের পশ্চাতে একজনকে রেখে সকলকে এক সারিতে দাঁড় করালেন, যেন এক প্রহারেই সকলকে বিদ্ধ করতে পারেন। অতঃপর রাজা শ্যামাবতীর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করে শর ত্যাগ করলেন। তাঁদের মৈত্রীভাণের প্রভাবে শরটি অর্ধপথ এসেই পর্বতপ্রতিহত পাষাণ-খণ্ডের ন্যায় যেদিক হতে এসেছিল সেদিকে ফিরে রাজার বক্ষঃ বিদ্ধ করবার

উদ্দেশ্যেই যেন তদন্তিমুখী হয়ে শূন্যমার্গে ছিন্ন হয়ে রইল।

রাজা তখন চিন্তা করলেন— “আমার নিষ্কিন্ত শর পাষণময় পিরিশ্রুত বিদীর্ণ করতে সমর্থ, শূন্যপথে প্রতিহত হবার কারণ নেই, অথচ শর আমার বৃকের দিকেই ফিরে রয়েছে। চিত্তহীন, প্রাণহীন এ নিজীব শরও এদের গুণমহাত্ম্য জানে। আমি মানুষ হয়েও জানি না, আমি একান্তই অধম ও পামর। ” এরূপ চিন্তা করে ধনুঃশর ছুতলে নিক্ষেপ করে, হাঁটু পেড়ে বসে কৃতাজলি পুটে শ্যামাবতীকে স্তব-বাক্যে বললেন—

‘সমুদ্রমুখ্যামি পমুদ্রমুখ্যামি, সন্ধ্যা মুদ্রমুখ্যামি যে দিসা,

শ্যামাবতি, মং তামসকৃৎ স্বপ্নং মে সরণং ভবা’তি। ”

দেবি, আমি মুহাম্মান হচ্ছি, প্রমুহাম্মান হচ্ছি, আমার সকল দিক, সব-বিশ্ব বিদ্রান্ত হচ্ছে; শ্যামাবতি, আমাকে ত্রাণকর, তুমি আমার আশ্রয় হও। ”

শ্যামাবতী বললেন— “মহারাজ, আমার শরণাগত হবেন না, আমি যার শরণাগত, উনি অন্তর বুদ্ধ; আপনি সেই বুদ্ধের শরণাগত এবং আমার আশ্রয় দাতা হউন। ”

‘শ্যামাবতি, আমি আরও অধিক বিদ্রান্ত হচ্ছি, আমি তোমার ও বুদ্ধের উভয়েরই শরণাগত হচ্ছি। দেবি, তোমাকে একটা বর দেব, তোমার যা ইচ্ছা, তা গ্রহণ কর। ” রাজা একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশস্থ সর ছুতলে পড়ে গেল। মৈত্রীর কেমন অলৌকিক শক্তি, তা প্রশ্নাধীন যোগ্য। সেরূপ করুণা, মুদিভা ও উৎসাহ সাধনার গুণও আশ্চর্য ও অচিন্তনীয়।

বুদ্ধের মৈত্রী-বিশ্বমৈত্রী, তাঁর বিশ্বমৈত্রী-বাণী—

“ দিষ্টা বা যে চ অদ্দিষ্টা—

যে চ দূরে বসতি অবিদূরে,

ভূতা বা সত্ত্ববেসী বা—

সক্বে সত্তা ভবন্ত সুখিত’তা ”

দৃশ্যমান প্রাণী, দূর-নিকটে, জলে-স্থলে-আকাশে ও অনন্ত চক্রবালে স্থিত প্রাণী, অনুবিক্ষেপ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট প্রাণী, যারা জন্মেছে এবং সত্তাব্য অর্থাৎ গভীরা অন্তঃ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও ঔষধাত্মক ইত্যাদি সমস্ত প্রাণী সুখী হউক। ” এরূপ অপ্রমেয় মৈত্রীকে বুদ্ধের মৈত্রী বা বিশ্বমৈত্রী বলা হয়। এমন অমৃত নিখর অপরূপ গুণধর্ম সমগ্নিত মহামৈত্রী একমাত্র বুদ্ধেরই দান। অন্তিম-জানী পরম পুরুষের

যেরূপ অন্তর---সেরূপই তাঁর বাণী, যেরূপ বাণী---সেরূপই তাঁর অন্তর এবং
বক্তাব ও চরিত্রও। তাই তাঁকে বলা হয় --‘মহামানব’।

মৈত্রী ও ক্ষান্তি অসীম সম্ভব। যেখানে মৈত্রী-- সেখানেই ক্ষান্তি, যেখানে
ক্ষান্তি-সেখানেই মৈত্রী। বোধিসত্ত্ব ক্ষান্তিবাদী তাপসের কাহিনীই এর সুলভ নিদর্শন

সুরামন্ত ক্রুদ্ধ বাণেশ্বরী রাজ কল্যাব্ জিতাসা করলেন--“তাপস, তুমি কোন্
মতাবলম্বী?” বোধিসত্ত্ব প্রত্যুত্তরে বললেন--“মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী।”
“ক্ষান্তি কা’কে বলে?” “লোকে গালি দিলে, প্রহার করলে, অথবা হানি করলেও
মনের যে অক্ৰোধ ভাব, এর নাম ক্ষান্তি।”

“আচ্ছা তোমার বিরূপ ক্ষান্তি দেখা যাক্।” এবলে তিনি জল্পদকে
ডাকলেন। ঘাতক কুঠার ও কষ্টককশাহস্তে এসে প্রণাম করে জিতাসা করল--
“মহারাজ, আমায় কি করতে হ’ব?” “এ দুটো তপস্বীটা চোর, একে টেনে
মাটিতে ফেল্ এবং দু’হাজারবার কষ্টককশা দিয়ে আঘাত কর্।”

ঘাতক তাই করল। তাপসের চর্ম-মাংস ছিঁড়ে গেল, সর্বজ হতে রক্তস্রোত
ছুটে মৃত্তিকা রঞ্জিত হল। তখন রাজা জিতাসা করলেন--“কি হে তাপস, এখন
তুমি কে’ন্ বাদী বলত?”

“মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভেবেছেন চর্ম-মাংসের নীচে
আমার ক্ষান্তি আছে, কিন্তু মহারাজ, সেখানে নয়, ক্ষান্তি আমার হৃদয়ভিত্তিক
প্রতিষ্ঠিত, তা দেখবার আপনার সাধ্য নেই।”

ঘাতক রাজাকে আবার জিতাসা করল--“এখন কি করব মহারাজ?”

তখন রাজা আদেশ করলেন--“এ ভক্তের হাত দু’খানা, পা দু’খানা এবং
নাসা-কর্ণ ছেদন কর্।”

ঘাতক তাই করল। রক্তস্রোতে ধরণী প্রাবিত হল। এবার রাজা জিতাসা
করলেন--“এখন বল, তুমি কোন্ বাদী?”

“মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি মনে করেছেন, আমার হস্ত-পদ
নাসা-কর্ণের প্রাপ্তে ক্ষান্তি আছে, সেখানে নয়, ক্ষান্তি আছে আমার অন্তরের
অন্তঃস্থলে।”

“ভক্ত অট্টাধারিন্, তুমি শুয়ে শুয়ে ক্ষান্তির স্পর্শ করতে থাক।” এবলে

বোধিসত্ত্বের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে প্রস্থান করলেন।

তখন সেনাপতি এসে বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাত করে প্রার্থনা করলেন--- “প্রভু
আপনার প্রতি যিনি অত্যাচার করেছেন, যদি ক্রুদ্ধ হন, তাঁর উপরই হবেন, অন্যের
উপর ক্রুদ্ধ হবেন না, রাজ্যের যেন বিনাশ সাধন না হয়।” তা শুনে বোধিসত্ত্ব
বললেন---

“হস্ত-পদ, নাসা কর্ণ হেদিয়া যেজন,

করিলেন মোর এই দারুণ পীড়ন;

চিরজীবী হয়ে সেই থাকুন নৃপতি,

মাদৃশ জনের ক্রোধ অসম্ভব অতি।”

রাজার পাপভার সহ্য করতে না পেরে উদ্যান দ্বারেই ধরিত্রী বিদীর্ণ হয়ে
রাজাকে গ্রাস করল এবং অবাচি মহানরকে নিক্ষেপ করল। সেদিনই বোধিসত্ত্ব
প্রাণ ত্যাগ করলেন।

এ তাপস-জন্মে বোধিসত্ত্বের ক্রান্তি, মৈত্রী, করুণা, মৃদিতা, উপেক্ষা, বীষ,
অধিষ্ঠান, শীল, নৈষ্কর্য্য, অলোভা, অদ্বेष, অমোহ, অক্রোধ, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও
সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বহুবিধ গুণধর্মের পূর্ণতা লাভ হল। এরূপ সিংহপুরষই দুর্লভ
বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী।

সংসারের সকল প্রকার পাপকে তন্তু করে, দণ্ড করে অথবা ধ্বংস করে
এ অর্থে তপস্বী বা তাপস। ক্রান্তিবাদী তাপসের এ জন্ম সার্থক হয়েছে। এ
দারুণ দুঃখ বরণ করে তিনি মহা লাভবান হয়েছেন। বোধিসত্ত্বের অপরিহার্য
পারমী ধর্মের পূর্ণতা লাভে সুদুর্লভ সম্যক সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভের সেতু নির্মাণ
করলেন।

অগতে এমন পরাশাস্তির উৎস উৎকৃষ্ট ধর্ম ক্রান্তি মৈত্রীরূপ মহাসম্পদ
বিদ্যামানে আত্মধ্বংসী নিকৃষ্ট ধর্ম ক্রোধ হিংসাকে কেন বরণ করে ? ইহাই বড়
আশ্চর্য।

শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান, তিফুকুলের উচ্ছল
রস, শিবসুন্দর গুণরাশিতে সমলঙ্কৃত, স্পিটিক বিশারদ, পালি-সংস্কৃত ও বাংলা
ভাষার সুপণ্ডিত, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষারও বিদ্যাবত্তা কম নয়। দেবনাগরী,
বাংলি, সিংহলী, শ্যামী ও ইংরেজী অঙ্করে লিখিত পালি-হিন্দী ও সংস্কৃত প্রভৃতি

বিবিধ প্রস্থানবাদের তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ‘বুই গাঁও পালি পারিবেন’ নামক বিরাট শিক্ষায়তন ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠা করে তথায় পালি, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবৎসর এ পরিবেশ হতে ছাত্রগণ আদ্য-মধ্য-উপাধি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে থাকে, তথায় অবস্থান করে মাস্ট্রিক-আই-এ, বি-এ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়। এ পরিবেশ ক্রমশঃ উন্নত হয়ে আরো কয়েকটা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যথ—অনাথআশ্রম, টাইপ রাইটিং শিক্ষা, বয়ন বিদ্যা ও সূত্রধর কার্য শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে যথারীতি শিক্ষা করে থাকে। মহাপ্রাণ উদারচেতা জ্যোতিঃপাল তাঁর কর্মনিষ্ঠ জীবন বুদ্ধশাসন ও জাতি বর্ণ নির্বিশেষে জনগনের পরম কল্যাণ সাধনে উৎসর্গ করেছেন। এরূপ অনলস-নিপুন কর্মী সমাজে দুলভ।

এই কৃতিপুরুষ চিরব্রহ্মচারী বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি মহাস্থবির জ্যোতিঃপালের কৃতিত্ব সম্যক উপলব্ধি করেছেন এশিয়া বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার সদস্যগণ, বিশেষতঃ বিশিষ্ট কর্মকর্তাগণ। তাই তাঁকে বাংলাদেশের পক্ষ হতে ‘এ-বি-চি-পি’র পঞ্চম কন্ফারেন্সের বৈঠকে আন্তর্জাতিক কার্যনিবাহক কমিটিতে সবসম্মতিক্রমে সদস্য পদে নিবাচিত করেছেন। তৎসঙ্গে মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়াও উক্তপদে নিবাচিত হয়েছেন।

মঙ্গোলিয়ার রাজধানী ‘উলান বাটোর’ (Ulan Bator) ১৯৭৯ সালের ১৬ই জুন, শনিবার অনুষ্ঠিত ‘এ-বি-চি-পি’র পঞ্চম কন্ফারেন্স কর্তৃক (The 5th General Conference of the Asian Buddhist Conference for Peace,) বাংলাদেশের জ্যোতিঃপাল মহাস্থবিরকে সম্মান ও গৌরবজনক মহা-মূল্যবান আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শান্তি পদকে ভূষিত করা হয় এবং এ পদক প্রাপ্তির উপযুক্ততার নিদর্শন স্বরূপ এক সনদপত্র (সার্টিফিকেট) প্রদত্ত হয়। এশিয়ার বৌদ্ধ সদস্যদের মধ্যে জ্যোতিঃপাল যে এ মহাদাগদের যোগ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করলেন, তা বাঙ্গালী বৌদ্ধ মাহাত্ম্যই গৌরবের বিষয়।

তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে যে কয়টা গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেছেন, পুণ্যক গ্রন্থই অতি মূল্যবান ও অমূল্যের আকার। তাঁর প্রথম পুস্তক—‘কর্মতত্ত্ব’। কর্মের অচিন্তনীয় বিপাক, বৈচিত্রপূর্ণ হর্ষ-বিষাদময় পরিণতি ‘কর্ম’ কুশল ও অকুশল ভেদে বিবিধ। কুশল সৃষ্টির নিদান, অকুশল দারুণ-দুঃখের সৃজন কর্তা। পুণী জগৎকে নিরন্তর করে একমাত্র কর্মই। হীন উত্তম সুখ-দুঃখ, সুগতি-দুর্গতি পণ্ডিত মুর্খ, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি বিভিন্নতায় রূপায়িত করে একমাত্র কর্ম। চেতনা অনুযায়ী

কর্মের সৃষ্টি হয়। তাই 'কর্মতত্ত্ব'—জটিল-দৃশ্য-দার্শনিকতত্ত্ব। প্রাণীদের উপলব্ধির বিষয়।, এ পুস্তকটি সমাজের বহু উপকার সাধন করবে।

দ্বিতীয় পুস্তক 'পুংগল পঞ্জিক্রতি'। ইহা বৌদ্ধ দর্শন অভিধর্মের অন্তর্গত চতুর্থ গ্রন্থ। বিভিন্ন পুঙ্কতি সম্পন্ন ব্যক্তির পরিচিতি। ইহাও আর এক জটিল তত্ত্ব।

তৃতীয় পুস্তক 'বোধিচর্যাবতার'। সপ্তম শতাব্দীতে মহাযানী পুস্টিক পণ্ডিত আচাৰ্য শান্তিদেব কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুণ্যস্পর্শী-চমৎকার ভাবগম্ভীর শ্লোকায়ক গ্রন্থ। বিশ্বজনীন উদারধর্ম সাম্য ও মৈত্রীই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। ইহা বিশ্ব সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি। জ্যোতিঃপাল এ মহাগ্রন্থের অনুবাদ করে বাঙ্গালী জাতির মহা উপকার সাধন করেছেন। তজ্জনা গৌরব বোধ করছি।

ব্রহ্ম বিহারের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়বিধ জ্যোতিঃপাল চিরব্রহ্মচারী। প্রায় অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল তিনি ব্রহ্মচর্য-ব্রত উদ্যাপন করে আসছেন। তাই ব্রহ্মবিহারীর আচর্য্যতব্য মৈত্রী-করণা-মুদিতা-উপেক্ষা নীতি-ধর্মের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁর মন-পুণ্য ব্রহ্মচর্যের অপূর্ব স্বেচ্ছায় উদ্ভাসিত। তাঁর অন্তর নিহিত কথা লেখনী-মুখে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা অপূর্ব-অদ্ভুত।

“ব্রহ্মাতি মাতা-পিতারা পুষ্কাচরিয়্যাতি বৃদ্ধরে” তথাগত বৃদ্ধের সুনীতিপূর্ণ এ অমোঘবাণী—মাতা-পিতা ব্রহ্ম সদৃশ, আদিগুরু ইত্যাদি উপমা আহরণ করে মাতা-পিতার গুণ সম্বন্ধে যা বিবৃতি দিয়েছেন তা অতি হৃদয়গ্রাহী এবং মাতা পিতার প্রতি পুত্রের অমানুষিক অত্যাচারের করুণ কাহিনীর মর্মস্পর্শী উপমাও যথোচিত শিক্ষণীয় হয়েছে। এই পরম উপদেশ প্রত্যেক পুত্র-কন্যার অন্তরে আলোক-পাত করবে। “বৃদ্ধের নীতিধর্মে শত্রু বলতে কেউ নেই, জগৎ মিলে পরিপূর্ণ” ইত্যাদি এ অধ্যায়টির বিষয়বস্তু বর্ণনা অতি চমৎকার হয়েছে। প্রত্যেক বিষয় যেন স্মৃতি নিব্বার।

“ক্রোধ জন্মি গুই ক্রমা-অনুগমা

যাহা আনি দেয় বোধি,

কেমনে লভিতে ক্রোধের কারণ

অরি না রহিত যদি।

লভিবারে যাহা করি প্রয়াস

সত্তত সেবির ধর্মে

তাই দিল মোরে শত্রু আমার

আঘাত হানিয়া মর্মে।”

“জগতে যারা সুখ-শান্তির অধিকারী হতে চায়, তাদের পক্ষে ক্রান্তি মৈত্রী-
উপেক্ষার আশ্রয় নিতে হবে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। দ্বৈষের সমান পাপ নেই,
ক্রমার সমান ভপস্যা নেই।”

প্রহ্লকের সংগ্রহীত ও রচিত সমস্ত বিষয়ই অতিশয় উপদেশ ও প্রাণস্পর্শী।
জগতের সর্বরসের শ্রেষ্ঠ রস ‘ধর্মরস’। সম্যক সম্বুদ্ধের বাণী অমৃত রসে
পরিপূর্ণ। মানব জীবনে উৎকর্ষ সাধন ও জয়যাত্রার মানসে প্রহ্লকের বহু আশ্বাস
স্বীকার করে অমৃত রসের আকর, সৌরভ-সুস্বাদু সর্বোত্তম পরিপূর্ণ ‘ব্রহ্মবিহার’
লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। কামনা করি জ্যোতিঃপালের প্রচেষ্টা সাফল্য
মণ্ডিত হউক, জয়যুক্ত হউক। ‘ব্রহ্ম-বিহার’ আলো দান করুক।

‘সব্বৈ সত্তা সুখিতা হোন্ত’

মির্জাপুর শান্তিধাম বিহার

চট্টগ্রাম।

১৪ | ১২ | ৭৯ ইং।

সংঘরাজ—

শীলালকার মহাস্থবির।

স্বীকৃতি

এ জগতে বহু ধর্ম, দর্শন ও মতবাদ প্রচলিত। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তকগণ নানা ধর্ম-নীতির প্রচার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছে। তাতে রয়েছে পরস্পর বিরোধ, পরস্পর মতভেদ। আবার বিরুদ্ধ সমালোচনা, খণ্ডন-মণ্ডন রয়েছে অনেক। কিন্তু ব্রহ্ম-বিহার অর্থাৎ সাম্য মৈত্রী, অহিংসা, করুণাদি তাৎপর্যে জগতের কারো মতভেদ নেই। ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতায় কিংবা হিত-কামনা, কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেনা—এ হেন প্রাণী জগতে বিদ্যমান নেই। সাধারণতঃ প্রাণী মাত্রই আত্ম-পরায়ণ, আত্ম-সর্বস্ব। স্বার্থের প্রেরণায় এ সবার আকাঙ্ক্ষা থাকা একান্ত স্বাভাবিক। মাতা-পিতার অপত্য স্নেহ-মমতায়, মিত্রের মিত্রতায়, আত্মীয়ের আত্মীয়তায় যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে, তা অন্তর্নিহিত সাম্য-মৈত্রীরই বহির্বিকাশ। এই তত্ত্ব সমস্ত প্রচারিত ধর্মের মূল-ভিত্তি ও প্রাণ-স্বরূপ। যারা ধর্ম মানে না, এমন কি, পম্প্রা ধর্ম সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ-কামী—এহেন মানব সঙ্ঘেরও যা মূল-মন্ত্র, সেই ব্রহ্ম-বিহার বা সাম্য-মৈত্রীই এ পুস্তকের বিষয়-বস্তু। এ জগতে সামাজিক যত বিবাদ-বিসম্বাদ, সাম্প্রদায়িক যত হিংসা-হত্যা, রাষ্ট্রীয় যত বিরোধ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধর্মীয় যত বিবাদ-বিসম্বাদ সংঘটিত হয়, তার একমাত্র কারণ—সাম্য, মৈত্রী-করুণাদির অভাব।

আজ ব্রহ্ম-বিহার পুস্তকাকারে মুদ্রিত দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গৌরবাগ্নিত। ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলাম বহু বৎসর পূর্বে। জীর্ণতা-প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি খানি কি করা হবে—এই নিয়ে ভাবনায় পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি গ্রন্থ বের করা সম্ভবপর হলেও ব্রহ্ম-বিহার আর্থিক কারণেই এত বিলম্বে প্রকাশিত হল।

অধুনা সংগঠিত পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশে-এক সুযোগ্য পরিচালক ও সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া মহাশয়ের সাথে এক স্তম্ভ লগ্নে আমার সাক্ষাৎ ঘটলে তিনি প্রস্তাব করলেন যে যদি আমার কোন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত থাকে, আমি যেন প্রকাশনার উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে দান করি। তাঁর প্রস্তাবানুযায়ী কিছু দিনের মধ্যে জীর্ণতা-মলিন পাণ্ডুলিপিখানি একটু পরিষ্কার

করে সর্বস্বত্ব পরিত্যাগ-পূর্বক তাঁর হাতে অর্পন করেছি সত্য, কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে দু'এক মাসের মধ্যে ইহা ছাপিয়ে বের করতে সক্ষম হবেন। তাঁর প্রাণের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি সংগঠনের শৈশবাবস্থা ও আর্থিক সংস্থানের উপর লক্ষ্য করেই সন্দিহান ছিলাম। বস্তুতঃ এখন দেখি—এই প্রতিষ্ঠানটি অতি সহসা এত বহনভাবে জন-প্রিয়তা অর্জন করেছে, যার ফলে স্বল্প কালের মধ্যেই বহু পুস্তক-পুস্তিকা বের করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রকাশন ক্রমে আমার ব্রহ্ম-বিহার সম্ভবতঃ নবম স্থান লাভ করেছে। ধর্মীয় ও সামাজিক সাধনার মহৎ পরিকল্পনা নিয়েই এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। ইহা সকল প্রকার ভেদ-বিভেদের উর্দ্ধে। বিশেষতঃ সকল শ্রেণীর জনগণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার কামনা এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য।

বিজয় বাবুর সাথে আমার পরিচয় থাকিলেও কার্ষতঃ ঘনিষ্ঠতা বেশী দিনের নয়। অল্প সময়ের মধ্যে যে চরিত্র আমি তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি—তাতে আমার এই প্রতীতি জন্মেছে এ জাতীয় লোকের দ্বারাই এসব জন-হিতকর কাজ সম্ভব। বিজয় বাবুর নিত্য সহচর সহকারী রূপে যে বন্ধু লাভ করেছেন,—তিনি হলেন শ্রীযুক্ত বাবু অজিত বরণ বড়ুয়া। তিনি একজন উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত ও সূলেখক। তাঁর সহযোগিতায় বিজয় বাবু প্রগতির পথে পরম সহায়তা লাভ করবেন, এই আশা পোষণ করি।

ইতিমধ্যে বিজয় বাবুর পরিবারে দু'টি সাক্ষর স্মৃতি নিজেদিত দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তাঁর সহধর্মিনী মহিষষী মহিলা শ্রীমন্তি আরতি বড়ুয়া পরলোক গমন করলেন এবং প্রাণ-প্রতিমা কনিষ্ঠা কন্যা 'লীনা' কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর স্নেহ-কোড় ছিন্ন করে হঠাৎ একদিন অন্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল। পরপর এই দু'টি মর্মস্পদ ঘটনা বিজয় বাবুকে অভিভূত করে কর্ম-নিষ্ঠা ও ধৈর্যচ্যুত করেছে বলে তাঁর বেদনা-বিদুর অন্তরের কোনরূপ আভাষ আমি পাইনি। আমি দেখি—সোসাইটির কাজে পূর্বাপর একিভাবে তিনি তৎপর। ধর্মশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সামাজিক হিত-সাধনার মোহ তাঁকে রীতিমতই পেয়ে বসেছে।

থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, জাপান প্রভৃতি বিদেশে পালি বুক সোসাইটির ন্যায় বহু প্রতিষ্ঠান দেখে এসে কত জল্পনা-কল্পনা করে ছিলাম। 'বোধিপগ' নামে এক দ্বৈ-মাসিক পত্রিকাও বের করতে আরম্ভ করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি রক্ষা করতে পারিনি। আমার অক্ষমতার জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

সামা, মৈত্ৰী, করুণাদির প্রভাবেই মানুষের অন্তরে পরোপকার সাধন-প্রবৃত্তি জেগে উঠে, মৃত্তিকাময় পৃথিবীর ন্যায় ত্যাগ তিতিক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মাতৃ-

হৃদয়ের ন্যায় ঔদার্য ও মহত্বের উদ্রেক হয়, তা হলেই মানুষের পক্ষে স্বার্থ বিসর্জন দিলে পরহিতার্থে তথা জগৎ-কল্যাণে কাজ করা সম্ভব হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানপ্রধান যুগের উচ্চ শিক্ষিত যুবকেরা ধর্ম শিক্ষা বা ধর্ম সাধনার প্রতি বড় একটা গুরুত্ব দিতে চায় না বলে সমাজে প্রায় সময় আক্ষেপ করতে শুনা যায়। বিশেষ করে, যারা ধর্মের হলনায় সমাজকে লাল পতাকা প্রদর্শন করে স্বাথসিদ্ধির পর গার্হস্থ্যপ্রমে প্রত্যাভর্তন করে, তাদের উপলক্ষে এ ক্ষেত্রে বক্তব্য এই,—সাধারণ শিক্ষাই হোক আর ধর্মীয় শিক্ষাই হোক, সকল শিক্ষার এক নীতি। শিক্ষা মাত্রই আদর্শ ভিত্তিক। আদর্শের প্রতিষ্ঠা শিক্ষার লক্ষণ। যে শিক্ষা মৌলিক আদর্শের অনুপ্রেরণায় না হয়ে বাহ্যিক প্রয়োজনবোধে অর্জিত হয় যে শিক্ষা জীবনের সাথে সম্পর্কহীন এবং শিক্ষা, আদর্শ ও জীবন এই তিনের মধ্যে যদি সমন্বয় সাধিত না হয়, তবে সে শিক্ষা নিষ্ফল, নিরর্থক। সুতরাং আদর্শহীন শিক্ষিত জীবনের পার্ণগতি যে নৈরাশ্যজনক হবে, তাতে বিচিহ্ন কি?

অন্ধভূতো অমং লোকে অনুকে'থ বিপস্‌সতি। অজানাজ্ঞকারে আচ্ছন্ন এই লোক। তারা অতীত বিরহ, যারা জগতের সত্য স্বরূপ দর্শন করে অবিদ্যার বিভীষিকা থেকে পলায়ন করতে সক্ষম। সাধারণ লোকজন মধ্যগত কাঁচা মৃৎপাত্র সদৃশ রূপ-গন্ধ-রসাদির জলুপ পূর্ণ মহা সমুদ্রে নিমেষে নিমগ্ন হয়ে বিলীন হতে বাধ্য। প্রকৃতির তারুণ্যে ও প্রবৃত্তির উন্মাদনার মধ্যে ধর্মের গভীরতা ঠাঁই পায় না, তলিয়ে যায়। তথাপি আপাতঃদৃষ্টিতে বিরূপ মনে হলেও ধর্মের নিশান ধরে উচ্চ শিক্ষা লাভ—ইহা ধর্ম ও সমাজের গৌরব। এই উচ্চ শিক্ষা তাদের জীবনে একদিন পরিপক্বতা লাভ করবে—ইহাই ভরসা।

ছোট বেলায় চট্টগ্রাম মহামুনি পালি কলেজে অধ্যয়ন কালে পরমাধ্য আচার্যদেব শ্রীমৎ ধর্মধার মহাশ্চরিত্র মহোদয়ের তৎকালীন সাময়িকী “শওহ-শক্তি” পত্রিকায় লিখিত “মৈত্ৰী-সাধনা” প্রবন্ধ পাঠ করে আমার যে ধর্ম-প্রীতি জেগেছিল,—তাই আমার জীবনের উৎস। তাঁর প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত আদর্শ ও ব্রহ্মত্ব-শক্তি-সংস্কার আমার অন্তরকে চুষক-স্বরূপ আকর্ষণ করেছে। দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যসিদ্ধির প্রচণ্ড প্রকোপে পড়েও সাম্য মৈত্ৰীর আদর্শ-ব্রহ্মত্বতায় আমি কখনো মানসিক প্রকল্লতা ক্ষুণ্ণ করিনি। আজ ব্রহ্ম-বিহার প্রণয়ন আমার একান্ত প্রহ-সাধনার নিদর্শন নয়। ইহা মৈত্ৰী-শাসিত অন্তরের ক্ষুদ্র বিকাশ। সাম্য-মৈত্ৰীর আদর্শ অনুপ্রাণিত অন্তরে আজীবন আচার্য উপাধ্যায়গণের অপরিসীম শুভাশীষ। দেশী-বিদেশী বন্ধু-বান্ধবের অকৃত্রিম প্রেম-প্রীতি ও শিষ্য সেবকগণের শুভেচ্ছা লাভ

করেছি বিপুলভাবে। আমি মনে করি আজ যে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শান্তি পদ
ও সনদ প্রাপ্তির সৌভাগ্য গড়ে উঠল—ইহা তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ।

বাংলাদেশের সর্ব-প্রধান ধর্মীয় নেতা, বাংলাদেশ সওঘরাজ ভিক্ষু-মহাসভা
সভাপতি, সম্প্রতি থাইল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া ও রাশিয়ায় সফরকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধি
দলের পরিচালক, মহামান্য সওঘরাজ শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাশুভির মহোদয় এই
গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখে সৌচব ও মর্মদা রুচি করেছেন। তজ্জন্য আমি
তার মহানুভবতার নিকট ঋণী। পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ বহু অর্থব্যয়ে
ব্রহ্ম-বিহার পুস্তক প্রকাশ করেছে। সোসাইটির কর্মকর্তাদের প্রতি আমার ধন্যবাদ
ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি ইহার চির-স্থিতি কামনা করি। বাংলাদেশ
বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সওঘ তথা এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার বাংলাদেশ জাতীয়
কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বিমলেন্দু বড়ুয়া এই ব্রহ্ম-বিহার পুস্তকের
পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন, তজ্জন্য
অশেষ ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা পোষণ করছি।

উদ্ভাসের পুস্তক প্রকাশ করে পাঠকের হস্তে অর্পণ করা লেখক ও প্রকাশকের
যৌথ দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে আমরা কতদূর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছি,
তা সহাদয় পাঠকগণ বিচার করবেন। এই পুস্তক প্রণয়নে যে সব গ্রন্থ, গ্রন্থকার
ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের সহায়তা লাভ করেছি,—আমি প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ।
এই পুস্তক দ্বারা যদি সমাজের সামান্যতম উপকার সাধিত হয়, তবে প্রকাশনার
অর্থব্যয় ও লেখকের পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

সকল সত্তা ভবন্তু সুখিত'তা।

শ্রী স্বেচ্ছা: মান মহাশয়

অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা : ২৫২৩ বুদ্ধাব্দ

অধ্যক্ষ,

১৬ই ডিসেম্বর '২৯

বরইপাঁও পালি পরিবেশ।

পোঃ ভোরাঙ্গগংপুর

ল'কসাম, কুমিল্লা

বাংলাদেশ।

ব্রহ্ম বিহার

সূচনা

মোহ-মলিন এ বিশ্ব, সদা হিংসা মত্ততায় উন্নত। নিষ্ঠুর অত্যাচার উৎপীড়নে বিক্ষুব্ধ। অসীম দুঃখ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ। স্বার্থের হানাহানি বিশ্বব্যাপী। জগৎ স্বভাবতঃ আত্ম-পরায়ণ ও আত্ম-সর্বস্ব। প্রত্যেকের চিন্তা ও চেষ্টা প্রত্যেকের নিজের দিকে। একের লুপ্ত দৃষ্টি পরসম্পদের উপর সর্বদা নিবদ্ধ। একের জীবন অন্যের রক্তমাংসের উপর নির্ভরশীল। দৈনন্দিন ভরণ-পোষণ ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে যেমন হিংসা-হত্যা, ধর্মের নামেও তেমন হিংসা-হত্যার অবাধ গতি। ঔরসজাত প্রথম সন্তানের স্বহস্তে গলায় বিসর্জন, সতী-দাহ, অজস্র প্রাণীহত্যা প্রধান ক্রিয়াকাণ্ড, সর্ব চতুষ্ক যাগ, সর্বদশক যজ্ঞ, নরবলি, নর-মুস্ক ছেদন, অসংখ্য প্রাণীবধ জনিত মৎস্য-মাংস ও মদ্যাদি সহযোগে মজলিশ ছিন্ন তদানীন্তন সমাজ ও ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। এগুলো ছিল ধর্ম, সমাজ ও নীতি শৃঙ্খলার বিস্তৃত নিদর্শনরূপে প্রচলিত। এক ধর্মের ভিত্তিতে অন্য ধর্মের বিলাস কল্পনা, ভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শিল্পের ধ্বংসসাধন এবং পরধর্মের উচ্ছেদসাধন পূর্বক স্ব-ধর্মের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ছিল ধর্মের চিরন্তন প্রথা-স্বরূপ। শাস্ত্র অধ্যয়নে দেখি ভিন্ন মতাবলম্বী ও ভিন্ন পন্থী ধর্ম-গুরু এবং তদনুসারী জনগণের প্রতি অসভ্যতা করতে, কুৎসা রটাতে কিংবা ধর্মমতকে কুযুক্তি দ্বারা নস্যাত করতে কুঠা বোধ হয়নি। আপন শাস্ত্রে পরমত ও পরধর্মের অবাস্তব সমালোচনা ও খণ্ডন মণ্ডন করতে গিয়ে নিজ গ্রন্থের কলবর বুদ্ধি, অধিকতর অধ্যায় রচনা করা

হয়েছে। পরধর্মের অসহিষ্ণুতা, স্বধর্ম প্রচারকল্পে বিপ্লব, অস্ত্রবল, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নৃশংস অত্যাচার ব্যাপকভাবে চলেছে।

স্বভাবতঃ ধর্মের সত্তা নিষ্কলুষ, নিষ্কলঙ্ক, নিবিকার। ধর্মের শিক্ষা সার্বজনীন, সর্বকালীন। ধর্মের উদ্দেশ্য আত্ম-কল্যাণ ও জগৎ-কল্যাণ। যথাসাধ্য জগতের হিত সাধন করে যাওয়াই ধর্মগুরুর ধর্ম-প্রাণতা। হিংসা-ক্রোধাদি জনিত জাগতিক বিষয়-বাসনা ধর্মের পরিচয় নহে। কাম-ক্রোধাদি সকল জীবে সমতুল্য। যেমন মানুষের অন্তরে তেমনি পশু-পক্ষী জীব-জানোয়ার প্রভৃতি সকল জীবের মধ্যে সমতুল্য ভাবেই নিহিত। এগুলোকে যদি ধর্মে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তবে ধর্মে ও পণ্ডিতের পার্থক্য কি? সুতরাং কাম-ক্রোধাদি ত্যাগই ধর্ম, ভোগ—ধর্মের অন্তর্গত নহে। কারণ ভোগে দুঃখ, ত্যাগে শান্তি। আর বীরত্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিংবা রাজ্য শাসনকে ধর্মের অঙ্গ বলে আখ্যা দিতে জগতের কোন মনীষীকে দেখতে পাওয়া যায়নি। এগুলো হচ্ছে জগতের অন্তর্নিহিত বিষয় বাসনারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি। ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধ কলহ বিগ্রহকে ধর্ম প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার ও বুনিয়াদ করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে নৈতিক বল দুর্বল, বিচার বুদ্ধিহীন অযোগ্য আধারে ধর্মের বিরূপ-পক্ষ শাস্ত্র-বুদ্ধি, ধর্মের গোড়ামি, অন্ধতা ও আত্মফালন—সে ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও নেতৃত্ব কামনা, আধিপত্য লোভ বলবৎ হয়ে দাঁড়ায়। সে ক্ষেত্রে ধর্মের নামে বিশোণ্ডার হয় মাত্র জগতে এরূপ মনোভাবের সংঘটিত হয়েছে সংঘর্ষ, বিরোধ, দুঃখ, অশান্তি। যেখানে প্রজ্ঞা ও চরিত্র মহাত্ম্যে ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি, যেখানে মানুষ যুদ্ধ ও অস্ত্র-বলের আশ্রয় গ্রহণ ও সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে ধর্মান্ধিয়ান চালিয়েছে। জনগণের অশেষ দুঃখ দুর্গতি, হত্যার তাণ্ডবলীলা ও ধ্বংসের চক্রমত্ব সাধন করেও যশঃ গৌরবের আত্মফালন ও বিজয়োল্লাস ঘোষণা ধর্মের নামে চলেছে। নারকীয় অগ্নিশিখাকে স্বর্গীয় সুষমার মুখোশ পরিয়ে মানুষের মধ্যে

ব্রহ্ম বিহার | ২

মানুষের অভিনয় প্রয়াস পেয়েছে। তাতে আত্ম-কল্যাণ ও জগত কল্যাণ সাধিত কতদূর হয়েছে?

এদিকে সকল ধর্মই একত্ব, সাম্য ও প্রেমের মহিমা কীতিত। অথচ কার্য-ক্ষেত্রে ধর্মায়তন ও আশ্রিত সমাজ বর্ণ বৈষম্য, ভেদ-বিভেদে পরিপূর্ণ। সব ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার অক্ষুণ্ণ নহে। এক ধর্মের আশ্রিত লোক অন্য ধর্মের আশ্রিত লোকের রোষ-ভাজন। এক বর্ণের আগমনে অন্য বর্ণের দূরে সরে দাঁড়াতে হয়। এমন কি, মানুষের সঙ্গে মানুষের একই সময় এক সাথে এক পথে যাতায়াত করাও সামাজিক নীতিতে নিষিদ্ধ। উচ্চবর্ণের যাতায়াত পথে নীচ বর্ণের যাতায়াত করতে হলে ঘন্টা বাজাবার বিধি প্রচলিত। একই ধর্মছায়ায় আশ্রিত উচ্চপদস্থ সন্ন্যাসিতের গম্ভব্য মন্দির নিম্ন পদস্থ জনগণের অনধিগম্য। সমাজ ও ধর্মনীতির কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের সাবলীল অধিকার নিহিত, কিন্তু নীচ বর্ণের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। পুরুষের জন্য প্রশস্ত কিন্তু মাতৃজাতির অবিধেয়। যে ক্ষেত্রে নিজের জন্য পরকে ধ্বংস করার নির্দেশ, স্বধর্মীর প্রাণ রক্ষার বিধানে বিধর্মীর শিরচ্ছেদ করার আদেশ, যে ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ, নর-নারী, জাতি-ধর্ম নিবিশেষে একইকালে একইস্থানে সমবেত হয়ে সকল সঙ্কীর্ণতা দূর করার সুযোগ পায় না, পূর্ণ মনুষ্যত্বের শক্তি স্মরণ করার, উপলব্ধি করার সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত, নির্দোষ সরলতা ও আনন্দের সাথে উৎসব অনুষ্ঠানে সকলের অংশ গ্রহণের সমান অধিকার সম্পূর্ণ অবৈধ, যেখানে মানুষে মানুষে এত ভেদবিভেদ, সীমাহীন সমুদ্রের ন্যায় অন্তরে অন্তরে বিরাট ব্যবধান, যে ক্ষেত্রে দল, কুল ও নিকায় ভেদে সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন, সে ক্ষেত্রে সাম্য ও প্রেমের তাৎপর্য কোথায়? সেখানে পবিত্র মৈত্রী করুণার নিদর্শন কোথায়?

এই বিশাল প্রাচীন উপ-মহাদেশ বক্ষে একদা দুশট-বিক্রান্ত, যুদ্ধ-দুর্মদ, উদ্ধত রূপাণ বিদেশী বীরের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে শিশু-

বাল-নারী নিবিশেষে হত্যার তাণ্ডবলীলা অনুষ্ঠিত। মঠ-মন্দির, চৈত্য-
 স্তূপ, সঙ্ঘারাম, সাধনাগার, যোজন বিস্তৃত অসীম সমৃদ্ধিপূর্ণ রত্নোদধি
 বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সর্ব সংস্কৃতি লুণ্ঠিত ও ধূলিসাৎ হয়েছে।
 শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অধ্যাপক অধ্যয়নশীলের অগণিত সংখ্যা কামানের ফুৎকারে
 এক মুহূর্তে শিমূল তুলা সদৃশ উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। তথাপি স্বদেশে
 ফিরবার পথে স্বল্প বোঝায় বহু রক্ত অপহরণ করেও যুগদোষ দূরাচার
 দুর্ভাগ্যের তৃপ্তি লাভ হয় নি। অবশেষে সর্বভূকের সহযোগে সর্বস্ব
 ভস্মীভূত করে শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট রেখে যায় নি। এরূপে
 হিংস্র ও লোভ ক্রোধান্ত অরাজকতার হস্তে উপমহাদেশের অমূল্য সম্পদ
 অনন্ত কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

আবার রাজনীতির ঐতিহাসিক রঙ্গ-ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়, দিগ্-
 বিজয়, অসুর বিজয় বা বিশ্বাধিপত্য প্রবল প্রভাব প্রতিপত্তি ও যশঃ
 গৌরবের নিদর্শন। জগতে রাজা মহারাজাদের মধ্যে আক্রমণ, যুদ্ধ,
 ধ্বংস, আধিপত্য বিস্তার ও আত্মসাৎ প্রভৃতি লোভ ও হিংসাত্মক কর্ম
 নৈপুণ্যে যারা যত বেশী শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন, তাঁদের
 ইতিহাসই তত বৃহত্তর ভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু তাতে কোনরূপ
 মানবদর্শনের প্রতিষ্ঠা কিংবা আলো প্রদর্শন করতে সমর্থ হয় নি।
 উপরে যে আঘাত খেয়েছে নীচে সে আঘাত ছুঁড়ে মেরেছে।
 লোভ ঘৃষের চরিতার্থতার বাসনায় নখ-দন্ত বিকীর্ণ করে আদিম
 পশুর ন্যায় ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্য কিংবা
 সম্প্রদায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জাতি, প্রদেশ বা অঞ্চলের
 ভিত্তিতে রাজ্য গঠন করে গণতান্ত্রিক সাম্যকে হত্যাকরে জীবনে অতি
 সামান্য ক্ষমতার অধিকারী যে হয়েছে, ক্ষমতার গর্বে সেও ক্ষমতা-
 হীনকে নগন্য কীট বলে তুচ্ছ করেছে। দুস্তীন নদ-নদী কিংবা
 দুর্লভ্য গিরিপর্বতের আবেষ্টনী ব্যতীত রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা
 নিদ্বারণের জন্য মানুষকে সমতল ভূমিতে কৃত্রিম পাঁচিল প্রস্তুত করতে

হয়েছে। জগতে কী ভীষণ ভেদ-বৈষম্য। এমনি আরো কত শত ঘটনায় প্রমানিত হয় যে লোভ দ্বেষের উন্মাদনায় মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। স্বার্থ বিরোধী হলেই মানুষ হিংসার চরমে উঠে।

সুদূর অতীতের হিংসাত্মক ঘটনাবলী বাদ দিয়ে চিন্তা করলেও আমরা দেখতে পাই, একই ধর্ম খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টেন্ট অনুসারীদের মতানৈক্যের জন্য সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ও রক্তপাতের যে বিষময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তা চিরকালের ইতিহাসকে কলংকিত করেছে। হীনযান মহাযানে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসানীতিকেও হিংসাত্মক কার্যকলাপ দ্বারা জন্মভূমি ভারত-বাংলা উপমহাদেশ থেকে চিরতরে নির্বাসিত হতে হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বহিরাগত নিরীহ জনগণের উপর মর্মান্তিক নির্যাতন, শাসক-শাসিতের মধ্যে হাঙ্গেরীর রক্তক্ষয়ী আত্মধর্ষণ, বর্মার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রভাবে কোরিয়ার আত্ম বিচ্ছেদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহাযুদ্ধে কামানের ভীম গর্জনে জগতের আকাশ বাতাস শুভিত। যুধ্যমান উভয়পক্ষের রোষাগ্নির উত্তাপ এখনো মেদিনী বন্ধ হতে অপসৃত হয়নি। হিরো-সীমা নাগাসাকিতে এটম বোমার অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান শিখা আজও অনির্বাণ। এক বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতনালী শুকাতে না শুকাতে আরেক বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় মানুষ প্রমাদ গুনছে। পাক-ভারত স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে বিভিন্ন অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাহাঙ্গামা তো আমরাই প্রত্যক্ষ করলাম। আরো প্রত্যক্ষ করলাম, সে দিনকার আসামের প্রাদেশিকতার নৃশংস অত্যাচার হিন্দুর প্রতি হিন্দুর, বাংলাদেশ আন্দোলন চলাকালে পূর্ব-পশ্চিমের পরস্পর ভীষণ রেষা-রেষি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, গোলাগুলি, কামান-টরপেডো ব্যবহারে জীবন মরণ সমস্যার উগ্র উত্তেজনা ও লক্ষ্য করলাম। এভাবে সবদিকে

আজ মানব সভ্যতা বিপর্যস্ত । ঘরে বাহিরে মানুষের জীবন বিপন্ন । ব্যক্তিগত, সমাজগত, সম্প্রদায়গত কিংবা রাষ্ট্রগত দ্বন্দ্ব । যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ-বিবাদ, বিরোধ, পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস সর্ববিধ অশান্তি জগতের সর্বস্তরে লেগেই আছে । অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার প্রবল শক্তি সহকারে প্ৰভাব বিস্তার করেই আছে । কার কীবা শক্তি এসব অপশক্তিকে সর্বতোভাবে নিরসন করতে সক্ষম হয় ?

বর্তমান যুগে মানুষ জ্ঞানে বিভ্রান্তে সভ্যতা ভব্যতায় অন্ধবেদী উন্নতি সাধন করেছে । ভবিষ্যতে আরো কত উন্নতি করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই । কিন্তু সুখ প্রয়াসী মানবের হাহাকারে জগৎ যে গঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে । একের প্ৰতি অন্যের বিরোধ, হানাহানি, এক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ের হামলায় ধন-মান-জ্ঞান হানির আশঙ্কা, সন্দেহ, আতঙ্ক । দেশ-ত্যাগ, রাজ্য-ত্যাগ রাষ্ট্র-সমূহ, পরস্পর পরস্পরের আচরণে শঙ্কিত । রাষ্ট্রনীতি সর্বদা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান । দলরক্ষা, মানরক্ষা ও সীমান্ত রক্ষায় কোটি কোটি মূদ্রা ব্যয় হচ্ছে । তাতে কী অদম্য তৎপরতা । এক রাষ্ট্র শঙ্কিত চিত্তে ভাবে কমিউনিজম যদি সমগ্র জগতে বিস্তৃত হয়ে পড়ে তবে আমাদের উপায় কি ? অন্য রাষ্ট্র চিন্তায় উদ্বিগ্ন—যদি ধন প্রলোভনে জগতের রাষ্ট্রপূজ একচেটিয়া এক হয়ে যায়, তবে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে কোথায় ? সেজন্য গোপন পুস্ততি, উচ্চা প্ৰদর্শন, হুমকী প্ৰদান, আনবিক ষোমার পুনঃ পুনঃ শক্তি পরীক্ষা ও দুঃসাধ্য মারণাস্ত্র আবিষ্কারের কঠোর সাধনা, চন্দ্রলোক গমন, চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পায়চারী, মহাশূন্যে অভিযান—আরো কত কি চলছে ।

বর্তমান যুগে মানুষ এত শক্তিদ্বর যে জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মিনিটের খবর মিনিটে জ্ঞানার পথ মানুষের কাছে অতিশয় সহজ ও সুগম হয়ে গেছে । তাতে সময় ব্যয়িত হয় না কিম্বা ভৌগলিক ব্যবধান বাধা জন্মায় না । মানুষ এত শক্তিমান,—

ব্রহ্ম বিহার । ৬

নিমিষে হাজার হাজার মাইল ব্যাপ্ত জাগতিক পদার্থ নিচয়কে ছিন্ন ভিন্ন ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে নিপুণ। স্বয়ং প্রাণী নহে, প্রাণীদ্বারা পরিচালিত নহে; এংহন লোকান্তকর জড়-পদার্থ মহাশূন্যে উড়ে উড়ে ভূত্যের ন্যায় মানব বুদ্ধির আদেশ বহন করে। কিন্তু কই শান্তি কোথায়? শান্তিকামী মানুষের অন্তর দৈনন্দিন বিষাক্ত আবহাওয়ায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ এসব জড়বিজ্ঞানের উন্নতি মানব কল্যাণের বালাই মাত্র।

বস্তু প্রধান বিজ্ঞান মানুষের প্রকৃত শান্তি আনতে পারে না। এদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিত্য সাময়িক ও বাহ্যিক। জড় বিজ্ঞানের সাধনা মানুষকে যত উন্নতির পথে নিয়ে চলছে, মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত সাধনা প্রবৃত্তি, নৈতিক চেতনা, মানবতা বোধ যেন মনুষ্য সমাজে দিনের পর দিন তত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ফলে, জগতে হাহাকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাধানের সম্ভাবনা নেই।

সৌর জগতের শক্তি পরীক্ষা, চন্দ্র মণ্ডলের গতি নির্ধারণ, অদ্ভুত এটম বোমার উদ্ভাবন, রকেট সাহায্যে ভ্রমণ আবিষ্কার, চন্দ্রলোক গমন, ঘন্টায় বিশ্ব-পরিধি পরিভ্রমণ ইত্যাদি অপেক্ষা বহু জন্মান্তরের সঞ্চিত অকুশল মনোরত্তির দমন ও কুশল মনোরত্তির সংগঠন অতিমাত্রায় দুঃসাধ্য। তার সাধনা কি মানব জীবনে তদপেক্ষা গুরুতর কর্তব্য নহে? বাহ্য-শক্তি বৃদ্ধি বৈপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্তঃশক্তি বৃদ্ধি পেত, সংস্কার জ্ঞাত অন্তঃশক্তির সহিত বাহ্যশক্তির সমন্বয় সাধিত হত, তবে আজ জগতে এত হাহাকার উঠত না। বস্তুতঃ জাগতিক আড়ম্বুর সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষে জড়-বিজ্ঞান যতই শক্তিমান হোক মনোবিজ্ঞানের উৎকর্ষ বিধানে নিত্য অচল অক্ষম বরং ইহা অপকর্ষের সহায়ক, অগ্রগতির বাধা। বাহ্যতঃ জড় বিজ্ঞানে সব কিছু সম্ভবপর হলেও সংস্কার সম্ভূত চরিত্রের পরিবর্তন অসম্ভব।

এ ক্ষেত্রে একটি রূপক কথার অবতারণা করা যাক :—কোন

এক গ্রামে অত্যন্ত দরিদ্র একজন লোক ছিল। বহুকণ্টে সে সংসার চালাত। চারদিকে তার অভাব অনটন। তার সংসারের বিড়ম্বনা আর সহ্য হয় না। একদিন সে মনের দুঃখে সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বসে বসে কাঁদতে লাগল। সেই বনে ছিলেন এক সাধু। সাধু লোকটিকে কাঁদতে দেখে বললেন,—কি হে কাঁদছ কেন? কি দুঃখ তোমার?

দরিদ্র লোকটি উত্তর দিল—বাবা, সংসারের অভাব অনটন, দুঃখ-কণ্ট আর সহ্য হচ্ছে না, তাই সংসার ছেড়ে বনে এসে পড়েছি।

সাধু বললেন—সংসারে দুঃখ দুর্দশা তো আছেই, থাকবেই, তার থেকে কি মানুষের রেহাই আছে? যাও, বাড়ী ফিরে যাও। দুঃখ কণ্ট সহ্য করতে শিখ।

লোকটি বলল—না বাবা, বাড়ীতে আর যাব না, এখানেই থাকব।

সাধু তার প্রতি করুণা ভরে বললেন—তোমার অভাব অনটন দূর করার ব্যবস্থা করে 'দিলে তুমি বাড়ী যাবে তো? এই বলে গুণীন সাধু বিড়বিড় করে কি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন এবং তিনবার হাততালি দিলেন। আর অমনি সম্মুখে এক দানব এসে হাজির। বিরাট ভীষণ তার চেহারা। গরীব লোকটি দেখে তো ভয়ে অস্থির। সাধু তখন লোকটিকে বললেন—এই নাও, একে নিয়ে বাড়ী যাও, যা হুকুম করবে, তা সে পালন করবে। তোমার অভাব আর থাকবে না। তবে মনে রেখ—এই দানবকে সর্বদা কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে।

লোকটি সাধুর কথামত দানবকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। বাড়ী ফিরে প্রথমেই হুকুম করল—এ যে বাড়ীর সামনে বন দেখছ—তা কেটে ছেটে সেখানে দালান কোঠা তৈরী করে শহর বানিয়ে দাও!

রাতপোহালে দেখা গেল—বাড়ীর সামনে রাজপুরীর মত দালান

কোঠা উঠেছে, তাতে লোকজন গমগম করছে। দেখে তো তাদের আনন্দ আর ধরে না। সবার মাঝে বিশ্বাস এল—হ্যাঁ সব কিছুই হবে। এরূপে একটার পর একটা কাজ দানব কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলল। এখন আর কোন কাজ বাকী নেই। দানব এসে লোকটির সামনে হাজির হয়ে বলল—আমার কাজ দাও; নচেৎ তোমার ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত শুষে খাব।

লোকটি তখন ভয়ে কাঁপতে লাগল। কোন কাজ খুঁজে পেল না। হঠাৎ তার মাথায় একটা বিদ্যুটে বুদ্ধি জুটল—ঈশ্বর হেসে সে দানবকে বলল—একটা কুকুর ধরে আন।

যে হকুম সে কাজ। দানব একটা কুকুর ধরে আনলে লোকটি বলল—দেখেছ, এর লেজটা কত বাঁকা এটা সোজা কর।

দানব কুকুরের বাঁকা লেজ সোজা করতে লাগল, কিন্তু সোজা হয় না। একবার টেনে ধরে আবার ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দিলেই তা বাঁকা হয়ে যায়। যতবারই টেনে সোজা করল ছেড়ে দিলেই আবার যে বাঁকা সে বাঁকা। দানব সারা জীবন কুকুরের লেজ সোজা করতেই রইল। দানব দ্বারা অন্যান্য সকল কাজ সম্পন্ন হল, কিন্তু কুকুরের লেজ সোজা হল না।

বেতার কেন্দ্রে বক্তা যা বলেন, প্রচারক যা প্রচার করেন, বেতার যন্ত্রটি অলিকল ভাবে তাদের শব্দের সজোর প্রতিশব্দ ও ধ্বনির উচ্চ প্রতিধ্বনি সম্পাদন করে মাত্র। কিন্তু বেতার যন্ত্রের আপন সত্তা, মৌলিকত্ব বা নৈতিকত্ব বলতে কিছুই নেই। বক্তার বক্তৃতায় প্রচারকের প্রচারণায় জড় যন্ত্রের সর্ববিধ শক্তি বুদ্ধি প্রসূত এবং সর্বদা বাহ্যিক। যে বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-হীন, তা অলীক নিষ্ফল। যেহেতু এসব যান্ত্রিক ক্ষমতা জানোত্তর নহে। শাস্ত্রে দেখা যায় মানুষ মনোবিজ্ঞানের সাধনায় দিব্য-দৃষ্টি,

দিব্য-শ্রুতি, পরচিত্ত বিষয়ক জ্ঞান, জাতিস্মর জ্ঞান, নানা প্রব
 বিভূতি ও আসক্তি ক্ষয়কর জ্ঞান লাভ করতেন। তদ্বারা পাখিব
 অপাখিব যখন যা দেখার প্রয়োজন, তখন তা দেখতেন। ই
 করলে মনুষ্যলোক অতিক্রম করে স্বর্গের শঙ্খধ্বনি ও নরকের ক্রন্দ
 শব্দ শুনতে পেতেন। অপরাপর লোক কখন কি ভাবছে, এ
 ভাবনার কারণ কি, উদ্দেশ্যই বা কিরূপ—চিন্তার সব বিষয় অবগ
 হতে পারতেন। বহুজন সমক্ষে হঠাৎ আবির্ভাব, হঠাৎ তিরোভাব
 স্বর্গ-মর্ত্য পাতালে গমনাগমন, চোখের পলকে চন্দ্রলোক সূর্যলোক
 পরিভ্রমণ, পক্ষীর ন্যায় আকাশে সঞ্চরণ, অসংলগ্ন ভাবে প্রাকারের
 পার-গমন ও পর্বত অতিক্রম, জলে ডুব দেওয়ার ন্যায় মাটিতে ডুব
 দেওয়া, মাটিতে চলার ন্যায় অনাদ্র ভাবে জলের ওপর চলা ইত্যাদি
 এমন কি দেবলোক, ব্রহ্মলোক পযন্ত মনোবিজ্ঞানীগণের করায়ত্ত
 ছিল। মনোবিজ্ঞান প্রসূত এসব অলৌকিক বিভূতিও ছিল একান্ত
 বাহ্যিক। আধ্যাত্মিক সাধনায় ছিল মানুষের আধ্যাত্মিক সকল সুখ
 সমৃদ্ধির বিধান, মানব চরিত্রের উৎকর্ষের সাধনা। তাতে ছিল
 মানুষের পরমানন্দ ও পরমা শান্তি বিহিত। তাতে মানুষের মধ্যে
 ছিল না পারস্পরিক সন্দেহ, ভয় কিম্বা আতঙ্ক।

জগৎ অন্তর্নিহিত দ্বিবিধ শক্তির প্রভাবে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত
 হচ্ছে। যথা, মোহ ও অমোহ। মোহ জীব জগৎকে মুহ্যমান
 করে রাখে। জগতের যথার্থ স্বরূপ জানতে দেয় না। অন্ধকার
 যেমন বস্তু নিচয়কে ঢেকে রাখে এবং চক্ষুর দৃষ্টি শক্তিকে ব্যর্থ
 করে দেয়, তেমনি মোহ অন্তরের সম্যক দৃষ্টিকে ব্যর্থ করে দেয়
 এবং জগৎকে আচ্ছন্ন করে রাখে, আসল বস্তুকে জানতে দেয় না।
 স্বাভাবিক গতি স্থিতি পরিণতির যথার্থ স্বভাবকে আচ্ছন্ন করে রাখা
 ও অস্বাভাবিক অবস্থা প্রদর্শন করা মোহের লক্ষণ। অন্যপক্ষে সত্যের
 উপলব্ধি ও বোধগম্য ক্ষমতা না থাকলেও উদ্ভট বুদ্ধি প্রসূত

যান্ত্রিক শক্তির উদ্ভাবন ও অপকৌশল সম্পাদনে মোহ অসীম ক্ষমতা-
 শালী। মানববুদ্ধি সমুদ্ভূত যত জড়শক্তি জগতে আত্মবিকাশ লাভ
 করেছে সেগুলির প্রায় সব কিছুই অন্তর্নিহিত মোহেরই দৃশ্যমান
 অভিব্যক্তি। অঘটন-ঘটন পটিরসী শক্তি ধারণ করে বলে যত দুঃখ
 অশান্তির সৃষ্টি করে। লোভ ও ঘ্রেষ এই দ্বিবিধ মনোবৃত্তি এবং
 তৎ প্রভাবিত সকল কর্ম মোহমূলক। মোহ জীবের সহজাত,
 নিত্য সহচর ধর্ম। বিনা উদ্যমে, বিনা চেষ্টা-যত্নে জীবের উপর
 প্রভাব সঞ্চারণে স্বতঃ প্রবৃত্ত। কিন্তু অমোহকে কঠোর সাধনায়
 উপলব্ধি করতে হয়। সূর্য উদিত হলে যেমন অন্ধকার তিরোহিত
 হয় ও জগতে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে জগতের দৃশ্যমান সকল
 বস্তুকে দৃষ্টিগোচরে আনে, তেমনি অমোহ মোহনী শক্তিকে পরাভূত
 করে জগতের যথার্থ স্বভাব উন্মোচিত করার উপযোগী শক্তি ধারণ
 করে এবং ন্যায় সত্য পথ উদ্ভাসিত করে জ্ঞানালোক প্রদর্শন করে।
 জগতের অলীক স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন থাকতে দেয় না। অমোহ বা জ্ঞানের
 চাপে পড়ে মোহ বা অজ্ঞানতা আপন সত্তাকে বিশ্ব দরবারে ব্যক্ত
 করতে বাধ্য হয়। অমোহের দীপ্তি গভীর, মাহাত্ম্য অতি দুরূহ।
 ইহা জ্ঞানীগণেরই জাতব্য, লব্য সত্য। ইহা সর্বসাধারণো বহির্বিকাশ
 লাভ করে সদ্য প্রস্ফুটিত অনিন্দ্য সুন্দর কুসুমের ন্যায় এবং ব্যবহৃত
 হয় সরল সহজ রূপ ধারণ পূর্বক। ইহা মধু হতে ও মধুরতর।
 ইহা মনোমুগ্ধকর প্রাজল ভাষায় অতীব শান্তিকর সহচার্যে সর্বজন
 সমক্ষে যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করে। এতে কাম-ক্রোধ, হিংসা
 বিদ্বেষ, বিবাদ-বিরোধের লেশ মাত্র বিদ্যমান থাকে না। থাকে
 জগতের প্রতি আপনত্ব বোধ, অশুণ্য দৃষ্টি ও অপাখিব সুষমার
 সুখময় সমাবেশ। এই অমোহ সজাত বহুবিধ গুণের শাখা-প্রশাখার
 মধ্যে এক বৃহত্তর শাখা অদ্বৈত, অহিংসা বা মৈত্রী করুণা। অহিংসা
 ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের এক শ্রেষ্ঠ
 অবদান। ইহা অবিদ্বান ও অকৃত্রিম সুখ-শান্তি আহরণ করে।

ব্রহ্মবিহার সাধনা

মৈত্রী, করুণা, মৃদিতা ও উপেক্ষা এই চতুর্বিধ গুণ-ধর্মের নাম ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মবিহারের সাধারণ অর্থ শ্রেষ্ঠ জীবন উদযাপন। ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মাগণ জগদ্বাসী অন্যান্য প্রাণীগণের প্রতি সর্বক্ষণ এরূপ ভাবে শুভেচ্ছা পোষণ করেন যে, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুক, যথালব্ধ সম্পদরাশি পরিভোগে কেউ বঞ্চিত না হোক। সর্বপ্রাণী স্ব স্ব কর্মাধীন। ব্রহ্মা সদৃশ মনুষ্যালোকে যাঁরা মৈত্রী ভাবনার ব্রত গ্রহণ করেন, যাঁরা অনুক্ষণ জগতের হিত কামনায় অভিরত, তাঁদেরকে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র কীট পিপীলিকাকেও আশ্রয় দর্শন করতে হয়। এমন কি, শয়নাবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত জাগরিত থাকে, নিদ্রিত হয়ে না পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি অসীম মৈত্রী ভাব পোষণ করতে হয়। এরূপে মৈত্রী ভাবনায় পরাশ্রুত না হয়ে যাঁরা সর্বক্ষণ অনুশীলনে নিমগ্ন থাকেন, তাঁরাই ব্রহ্মবিহারী নামে অভিহিত হন। তাঁদের এরূপ মহানুভব জীবন যাত্রাকে ব্রহ্মবিহার বলা হয়। তদ্ব্যতীত তথাগত বুদ্ধ মৈত্রীসূত্রে বলেছেন :

মাথ্য যথা নিয়ং পুত্তং আম্বুসা এক পুত্তমনুরক্খে,

এবামিন সর্বভূতেসু মানসত্তাবযে অপরিমানং ।

মেত্তঞ্চ সর্ব লোকস্মিং মানসত্তাবযে অপরিমানং,

উদ্ধং অধো চ তিবিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবের মসপত্তং ।

তিট্ঠক্করং নিসিন্নো বা সমানো বা যাবতস্স বিগত মিন্ধো,

এতং সতিং অধিট্ঠেয়াং ব্রহ্মমেতং বিহার মিধমাহ ।

সুত্ত—নিপাত

মা যেমন আপন প্রাণ দিয়েও নিজের একমাত্র সন্তানকে রক্ষা করেন, সেরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অন্তরে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে।

উর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, উত্তরদিকে, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমেয় দয়াভাব পোষণ করবে। কি দাঁড়াতে, কি চলতে, কি বসতে, কি শুতে, যাবৎ নিদ্রিত হয়ে না পড়বে এই মৈত্রী ভাবনায় অধিষ্ঠিত থাকবে। ইহাকেই বলে ব্রহ্ম বিহার। ম'নুষ্যের কর্মশক্তি যেখানে আপনাকে আপনার আত্মীয় স্বজনকে, আপনার দলকে, দেশকে অতিক্রম করে যায়, সেখানেই মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করে। এই ব্রহ্ম বিহার বা মৈত্রী-করণা-মুদিতা—উপেক্ষা সম্পর্কিত আলোচনাই এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য।

মৈত্রী, যুদ্ধ ও আমিষাহার

মিদ্ ধাতু নিম্পন্ন মিত্র শব্দের অর্থ—যিনি স্নেহ করেন, তিনি মিত্র। মিত্রের প্রতি মিত্র যেই ভাব পোষণ করেন তা'ই মৈত্রী। ইহা মানসিক প্রচণ্ডতা, রুক্ষতা ও কঠোরতা বর্জন করে। অহিতকর বিষয় অবলম্বনে যেই দ্বেষ উৎপন্ন হয়—তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সৌম্য ভাব ধারণ করে। যার প্রতি মৈত্রী পোষণ করা যায়, তার প্রাণ বধ, সম্পত্তি হরণ, ব্যাভিচার সমর্থন, কিংবা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা, পরুষ, পিশুন বাক্যাদি ব্যবহার করার প্রবৃত্তি থাকে না। মৈত্রীর আরেক প্রতিশব্দ অব্যাপদ। পরের হিত-সুখের বিপদাকাঙ্ক্ষা, পর দুঃখ কামনা, পরানিষ্ট চিন্তাই ব্যাপাদ। নিজের অনিষ্ট সাধিত হতো, প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি সম্পাদিত হলে অথবা অপ্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুর হিত-সুখ বিধানে এই ব্যাপাদ মনো-বৃত্তি অন্তরে স্থান লাভ করে। এই ব্যাপাদ চিন্তে উৎপত্তিতে বাধাদান, পরিত্যাগ ও ধ্বংস করার একমাত্র হাতিয়ার—মৈত্রী। এই জন্য মৈত্রীকে অব্যাপদ বলেও পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করেছেন। অসুত্তর নিকায় গ্রন্থে

উক্ত হয়েছে :—

নাহং ভিকৃৎসবে অঙ্কঃ এক ধম্মম্পি সমনুপস্সামি যেন
অনুপ্পম্মো বা ব্যাপাদো নুপ্পজ্জতি, উপ্পম্মো বা ব্যাপাদো পহীযতি—
যথামিদং ভিকৃৎসবে মেত্তা চেতো বিমুত্তি —“হে ভিক্কুগণ। আমি
অন্য একটি মনে বৃত্তিও দেখতে পাইনা যার প্রভাব অন্তরে স্থান লাভ
করলে ব্যাপাদ (অন্যের অহিত চিন্তা) কোন দিন অন্তরে উৎপন্ন
হতে পারে না বা উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ লাভ করে না কিংবা
উৎপন্ন ব্যাপাদ তৎমূহূর্তে অন্তহিত হয়ে যায়—সেই একমাত্র মনোবৃত্তি
হচ্ছে—মৈত্রী। যা সর্বপ্রকার কলুষ হতে চিত্তকে বিমুক্ত রাখে।
ইহা আত্ম—পন্ন উভয়ের হিত সাধনে পরম আত্মীয় তুল্য। এই
মৈত্রীর অপর নাম—অহিংসা। অহিংসায় পৃথিবীর কোন ধর্ম সম্প্র-
দায়ের মতভেদ নেই। তা সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি ও প্রাণস্বরূপ।
যারা ধর্ম মানে না, এমন কি, সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের যারা উচ্ছেদ-
কামী, এহেন মানব সত্ত্বেরও যা মূলমন্ত্র—সেই মৈত্রীই এই গ্রন্থের
বিষয়বস্তু। এখন এ ক্ষেত্রে কতক আনুষঙ্গিক কথা অবতারণা
করতে হয়।

এই মৈত্রী বা অহিংসা কিন্তু একেক যুগে একেক শাস্ত্রে একেক
গ্রন্থে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। শাস্ত্রের বিভিন্নতা বা কালের
ব্যবধান হেতু শব্দগত অর্থের পার্থক্য না থাকলেও অহিংসার তিন
তিন তাৎপর্য ও স্বরূপের অসামঞ্জস্য আছে অনেক। কোন শাস্ত্রে
শুধু স্বধর্মীয় লোকের মধ্যে পরস্পর দ্রাতৃত্বভাবেই অহিংসা কিন্তু তিন-
পন্থী জনগণের সম্পর্ক মনোভাব ও ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন
শাস্ত্রে এই অহিংসা প্রতিবেশী বা মনুষ্য জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।
অজস্র নিরীহ প্রাণীর প্রাণ-হানিতে অহিংসা নীতির অঙ্গহানি আরোপিত
হয় না। মহাভারতে অহিংসার অঙ্গপ্রশংসা বর্ণিত হলেও তার
স্বরূপ কিন্তু অন্য। তদানীন্তন ব্রাহ্মণ্য সমাজ অহিংসার আদর্শকে

স্বীকার করতেন, কিন্তু তার ব্যাখ্যা করতেন অন্যরকম :—

অহিংসা পরমো ধর্মস্তথা হিংসা পরং তপঃ ।

অহিংসা পরমং সত্যং যতো ধর্মঃ প্রবর্ততে ॥

অনুশাসন পর্ব ১১৫/২৫

অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসা পরম তপঃ, অহিংসা পরম সত্য যা হতে ধর্ম-জীবন প্রবর্তিত হয়। এই বহু প্রশংসিত অহিংসা শব্দের স্বরূপ হচ্ছে—মাংস ভক্ষণ বিরতি। এই অহিংসা জীব-হত্যা, যজ্ঞ বিরতি কিংবা যজ্ঞ বিরোধী নহে।

অপ্রোক্ষিতং বৃথা মাংসং বিধি-হীনং ন ভক্ষয়েৎ ।

মস্তপুত না করে বৃথা মাংস ভক্ষণ করা অবৈধ, এই মর্মে অন্য গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে—

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্ মাংসং ।

মহাসংহিতা ৫/২৭

অর্থাৎ মস্তপুত নহওয়া মাংস ভক্ষণ করা বৈধ।

বিধিনা বেদ দৃষ্টেইন তদ্ ভুক্ত্বাহ ন দুশ্যতি ।

যজ্ঞার্থে পশুবঃ সৃষ্টা ইত্যাপি শ্রায়তে শ্রুতি ॥

অনুশাসন পর্ব ১১৩/১৫

অন্য এক স্লোকে অশ্বমেধ পুভূতি হিংসাত্মক যজ্ঞ-বিরতির পক্ষে উৎসাহদান ও আমিষাহার বর্জনের পক্ষে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন : “মাসে মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের যে ফল, একমাত্র মাংসাহার ত্যাগ করলেই সে ফল পাওয়া যায়। কিন্তু যজ্ঞার্থ উৎসর্গীকৃত প্রাণী হত্যাজনিত মাংস প্ৰসাদে কোন প্রকার হিংসা হয় না। ইহাই শ্রুতি শাস্ত্রের বিধান। শুধু এই বলেই শাস্ত্রকার নিয়ম বিধানোচ্ছান্ত হলেন না :—

বীৰ্যোনোপার্জিতং মাংসং যথা ভুজ্জন্ ন দুশ্যাত,

ততো রাজর্ষয় সর্বে মৃগয়াং যান্তি ভারত ।

নহি লিপ্যন্তি পাপেন ন চৈতৎ পাতকং বিদুঃ ॥

অনুশাসন পর্ব

ব্রহ্ম বিহার । ১৫

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মৃগয়া-লব্ধ আরণ্য পশুর মাংস ভক্ষণ অবৈধ নয়। কারণ, সমস্ত রাজা মহারাজাগণ মৃগয়ায় গমন করেন। তাতে কোনরূপ পাপে লিপ্ত হতে হয়না। ইহাও অহিংসার অন্তর্গত। রাজনীতিতে তখনকার রাজা মহারাজাগণ অহিংসা নীতির অনুসরণ করতেন বটে, কিন্তু উচ্চতম নৈতিক জ্ঞানের 'অভাবে, কিংবা রাজ্য শাসন কর্তব্যের দায়ে, হিংসা হত্যা যে করতেন না, তাও নহে। এমন কি, প্রানদণ্ড বিধানেও ইতস্তঃ করতেন না। আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক যুদ্ধের পক্ষপাতী হলেও আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধের সমর্থক ছিলেন। গীতায় অহিংসার আদর্শ চারিভায়া-নীতি হিসাবে বারবার উপদিষ্টও হয়েছে এবং যুদ্ধের উৎসাহ দানও তাতে রয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কোন কোন পণ্ডিত যদিও বলেন যে বৈদিক যজ্ঞ-বিধি অনুসারে যে প্রাণী হত্যা অবশ্য কর্তব্য তারই বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ধর্ম-নীতি অহিংসার এতখানি প্রাধান্য দিয়েছে। এরূপ উক্তির যথার্থতা সবক্ষেত্রে স্বীকার্য নহে। কারণ ধর্মনীতি মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে। অহিংসা নীতি যখন আধ্যাত্মিক প্রয়োজন বোধ ত্যাগ করে বাহ্যিক কারণে ব্যবহৃত হতে থাকে তখনই ইহা সামঞ্জস্যহীন সীমাবদ্ধ রূপ ধারণ করে। ফলে, প্রাণের ধর্মপ্রাণের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। ভিন্ন বুদ্ধির ভিন্ন প্রয়োজনে অপকৌশল সংযুক্ত হয় মাত্র। বস্তুতঃ অহিংসা নীতিতে বিরোধ কিংবা পক্ষপাত সম্পর্কিত কোন ভাবই থাকতে পারে না। বুদ্ধ প্রদর্শিত কোন নীতিই দেশ, কাল, জাতির সীমায় সীমিত নহে। কোন বস্তু, ব্যক্তি বা সত্ত্বকে উপলক্ষ্য করে উপদিষ্ট হলেও তা জগতের প্রাণিগণের সার্বজনীন কল্যাণ সম্পর্কেই উপদিষ্ট হয়েছে। যদি এরূপও ধারণা করা যায় যে, জগতের হিংসা হত্যার বিরোধিতা করার জন্য কিংবা ইহা নিবারণ করার উদ্দেশ্যে অহিংসার উপলব্ধি, উপদেশ ও প্রচার করা হয়েছে।

তা ও সর্বৈব সত্য নয়, বরং যথার্থ সত্যের কিছুটা অপলাপ মাত্র। কারণ সর্বত্র সর্বশক্তিধর অহিংসার মূর্ত প্রতীক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অতি উচ্চাঙ্গের নৈতিক বোধের প্রেরণাতেই নীতির প্রচার প্রতিষ্ঠা করে গিয়াছেন। কোন দেশ, কাল, পাত্রের বিশেষ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে উপদেশ দিয়ে যান নি। পরিস্থিতি যা ছিল, এখনো তা আছে এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। ব্যক্তিগত বা সমাজগত ভাবে কে কার জন্য কি করতে পারে? মহাপুরুষগণ জগৎ জোড়া হিংসা হত্যার কি সমাধান করতে পেরেছেন। আপন আপন হিংসা বিদ্বেষ মূলক মনো প্রদোষিকার নিরসন করে অহিংসার পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি করেছেন এবং জগতের আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন মাত্র। বাহ্যিক অনায়াস অত্যাচারের প্রভাব বিশ্ব বিস্তৃত। একে জয় করার সাধ্য কার? তবে আপনার অন্তর শত্রু-শূন্য হলে জগৎ যে শত্রু-শূন্য হয়ে যায়,—এই আদর্শ প্রদর্শন করে আচার্য শান্তিদেব বলেছেন—

ভূমিং ছাদস্মিতুং সৰ্ব্বাং কুতশ্চমম্ ভবিষ্যতি,

উপান চমম্ মাত্রেন হুমা ভবতি মেদিনী।

বোধিচর্যাবতার

সমগ্র জগৎ আচ্ছন্ন করার জন্য একখানি চর্মখণ্ডের প্রয়োজন। কারণ, জগৎ ধূলিবালি, পাক-কাদা, গোঁজা-কঠকে পরিপূর্ণ। লোকের চলাফেরার অসুবিধা, তাই বলে এত বড় চর্ম কি পাওয়া যাবে? তা পাওয়া কখনো সম্ভব নয়। কাজেই আপন উপায়েই চর্মে জগতের যতটুকু অংশ আবৃত হয়, এতেই মনে করতে হবে যে আমি সমগ্র জগৎ আচ্ছন্ন করে ফেললাম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতার মর্মেও আমরা অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। জগৎকে ধূলি-বালি শূন্য করা কোন উপায়েই সম্ভবপর নহে। যাতে ধূলি-বালি স্পর্শিত না হয়, পদ-যুগলে জুতা পরিহিত হলেই জগৎকে ধূলিবালি শূন্য করার উদ্দেশ্য সফল হয়। এতে এই প্রতীতি, জন্মে যে

অহিংসাদি ধর্ম বাহ্যিক কারণে প্রচারিত হয়নি, হয়েছে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে। আপন গুণবলে আভ্যন্তরীণ সকল শত্রু নিহত হলেই বহিঃজগৎ শত্রু শূন্য হয়। যেহেতু অন্তঃশত্রুতাই বহিঃশত্রুতা সৃষ্টি করে। এতে এই যুক্তিও বড় সঙ্গত যে, বহিঃশত্রুতা অপেক্ষা আপনার জীবনে অন্তঃশত্রুতা অধিকতর মারাত্মক। নিজেই নিজের বড় শত্রু। এখানেই ধর্মের বড় সার্থকতা।

তথাগত বুদ্ধ যুদ্ধ সম্পর্কিত কোনরূপ উপদেশ কাকেও লক্ষ্য করে দিয়েছেন কিনা এখানে তার সামান্য আলোচনা করব। পালি গ্রন্থের সর্বত্রই দেখা যায় বিবাদ, কলহ ও যুদ্ধ বিগ্রহের কুফল বর্ণনা। অন্ততঃ আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধের প্রেরণা বা ইজিত প্রদান সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রে কোথাও দৃষ্ট হয় না। কোশল রাজ প্রসেনজিৎ ও অজাতশত্রুর মধ্যে কাশীগ্রাম নিয়ে বিবাদমান ঘটনা উপলক্ষে ভিক্ষু-দিগকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :—

জয়ং বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিতো,
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়—পরাজয়ং।

ধর্মপদ

জয় শত্রুতার সৃষ্টি করে। অপরকে পরাজিত করলে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। পরাজিত ব্যক্তি ক্ষোভে দুঃখে ম্লিয়মান হয়। জয়-পরাজয় পরিত্যাগী উভয় অবস্থার মধ্য-পন্থীই পরম সুখী। রোহিনী নদীর জল সেচন নিয়ে শাক্য ও কোলীয় রাজাদের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে যুদ্ধে রূপায়িত হওয়ায় যুদ্ধের নিরসন কল্পে করুণাঘন বুদ্ধ সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হস্বে বিবাদমান উভয়পক্ষের মাঝখানে সমাসীন হলেন এবং বহু উপদেশে যুদ্ধোন্মত্ত উভয় সেনা বাহিনীকে শান্ত ও সংযত করলেন। যুদ্ধ বারণ করলেন। বারংবার উচ্চারণ করলেন :—

কলহস্মিং হি অসাদো নাম নথি,

যুদ্ধ-বিগ্রহে, কলহ বিরোধে শান্তি নাই। ইহা বড়ই অশান্তি ও অনর্থকর। অজাতশত্রু কতৃক আক্রান্ত হওয়ার প্রাক্কালে বৈশালীর রুজি-সঙ্ঘ সম্পর্কে তথাগত মগধের প্রধান মন্ত্রী বর্ষকার ব্রাহ্মণ কতৃক বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলেন বটে; কিন্তু কোন প্রশ্নের জবাব দিলেন না। এ সম্পর্কে আনন্দ স্ববিরের নিকট যে মন্তব্য করে-ছিলেন, তাতে রুজি রাজ্যের ঐক্য, শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র ও চারিত্রিক নীতির প্রাধান্যই প্রকটিত হয়েছে। এতে যুদ্ধের জন্য কোনরূপ প্রেরণা বা ইঙ্গিত আদৌ প্রকাশ পায়নি। যুদ্ধসম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে তথাগত বর্ষকার ব্রাহ্মণের সাথে আলোচনা করাও সমীচীন মনে করেননি। যেহেতু এ জাতীয় আলোচনা শাস্ত্রে ধর্ম-বিষয় বিরোধী বলে উল্লেখ আছে। নচেৎ এতবড় বিখ্যাত রাজ্যের একজন প্রধান মন্ত্রীর সাথে আলোচনা না করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছিল না। পরে তিনি আনন্দ স্ববিরকে জিজ্ঞেস করে জানতে চেয়েছেন যে তথাগত কতৃক প্রদত্ত উপদেশ তখনো রুজি রাজ্যে প্রতিপালিত হচ্ছিল কিনা? আনন্দ স্ববিরের জবাবে তিনি মন্তব্য করলেন যে যতদিন রুজি-সঙ্ঘ ঐসব নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবে, ততদিন তাদের রুজি-বৈপুল্য বাতিল পরিহানি ঘটবে না। কোন কোন পণ্ডিত বলেন 'বুদ্ধ যুদ্ধের নিন্দা করেন নি কিংবা আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধের সমর্থন করতেন'—এ সকল উক্তি আদৌ সত্য নয়। পূর্বে উল্লেখিত পালি শ্লোকে ও ছত্রে যুদ্ধের নিন্দা সূচিত না হয়ে কি প্রশংসা বা প্রেরণা পেয়েছে? আত্মরক্ষা-মূলক প্রতিরোধ—রাজনীতি বা সমাজনীতির দিক দিয়ে অপরাধ সিদ্ধান্ত না হলেও অহিংসার সূক্ষ্ম বিচারে বিরোধ, বিদ্বেষ ও হিংসাই প্রতিপন্ন হয়।

হিন্স্ ধাতু নিষ্পন্ন হিংসা শব্দের অর্থ ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্ষতি, অপকার, পরানিষ্ট-সাধন প্ররুতি, হত্যা, বধ ইত্যাদি। আক্রমণ কারীর যেই মনোরুতি সাধারণতঃ আক্রান্ত ব্যক্তির সেই মনোরুতিই

উৎপন্ন হয়। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তি আক্রমণকারী প্রতি মৈত্রী বা অহিংসা পোষণ সম্ভবপর নহে। সিদ্ধ পুরুষকে হত্যা কারীর প্রতিও করুণা পোষণ করতে দেখা গিয়েছে। সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহ আত্মরক্ষা মূলকই হোক কিংবা প্রতিরোধ মূলকই হোক, অহিংসা সহযোগে অসম্ভব। দ্বেষচিত্ত উৎপাদনই হিংসা। দ্বেষচিত্ত উৎপাদন মনুষ্য জীবনে বড় অপকার বলে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। সাধনার প্রভাবে যাঁদের দ্বেষ-চিত্ত সমূলে উৎপাটিত, আক্রান্ত হলেও তাঁদের দ্বেষ-চিত্ত উৎপন্ন কোথা থেকে হবে? ইহা অতি মানবতার নিদর্শন। মহা-মোক্ষপ্লাম্বন ও যীশুকৃষ্ণের জীবন ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। হিংসার চরম অবস্থা-বধ, হত্যা, চিত্তের সূক্ষ্মতম বিচারে দৈহিক ও মানসিক পঞ্চবিধ অঙ্গক্রিয়া সম্পন্ন হলে প্রাণী হত্যায় পরিণত হয়। পাঁচ অঙ্গের এক অঙ্গ যদি অসম্পন্ন থাকে, তা হলে প্রাণীহত্যা হলেও তাঁর জন্য দায়ী হয় না। এমন সব ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রাণী আছে, যারা রহস্তের অঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণীর অঙ্গ সঞ্চালনে অঙ্গক্ষ্যে আঘাত প্রাপ্ত হলে মরে যায়। এক্ষেত্রে প্রাণী জীবন নাশ প্রাপ্ত হলেও পঞ্চাঙ্গের পরিপূর্ণতার অভাব বলে যৎ কতক প্রাণী নিহত হল, সে হত্যার জন্য দায়ী হয় না। পঞ্চাঙ্গ :

পাণো ভবে পাণ সঞ্জ্ঞী বধক চিত্ত মুপক্কমো,
তেন জীবিত নাসো চ অঙ্গা পঞ্চ বধস্‌সিমে।

সংখ্য রত্নাকর

- ১। হত্যার যোগ্য প্রাণী হওয়া চাই।
- ২। হত্যাকারীর মনে প্রাণী বলে ধারণা হওয়া চাই।
- ৩। বধ করার চেতনা উৎপন্ন হওয়া চাই।
- ৪। তদানুসারে বধের প্রচেষ্টায় উপক্রম বা আঘাত হানা চাই।
- ৫। সেই আঘাতে প্রাণীর মৃত্যু হওয়া চাই।

এই পাঁচ অঙ্গ সম্মিলিত হলেই প্রাণী হত্যা কার্য সম্পাদিত

হয় শুধু মানসিক হিংসা দ্বারা প্রাণী হত্যা যেমন হয় না, তেমনি মানসিক হিংসা দ্বারা মাংস ভক্ষণও হয় না। এদিক দিয়ে বিচার করলে বুঝা যায়,—হত্যাকারী ব্যতীত অন্য কেহ দায়ী হয় না। যত্র তত্র মানুষের প্রশ্ন :—আমিষহারী লোক কিরূপে অহিংসা পন্থী হতে পারে? তাদের ধারণা হত্যাকারীর ন্যায় মাংস-ক্রেতা, মাংস-ভোক্তা ও মাংস-বাহক সবাই হিংসার জন্য সমভাবে দায়ী। তজ্জন্য যতসব প্রশ্ন আর তর্ক-বিতর্ক। তথাকথিত মাংস ভক্ষণ বিরতি মূলক যে অহিংস নীতির কথা শাস্ত্রে আছে সেই সংস্কার বলে এই সকল প্রশ্নের উত্থাপন হচ্ছে থাকে। রাজা অজাত-শত্রুর রাজত্ব কালে দেবদত্ত পাঁচটি প্রস্তাব নিয়ে বুদ্ধ সকাশে উপস্থিত হলেন। তখন তথাগত বুদ্ধ রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাব হল এই :—

সাধু ভট্টে, ভিক্ষু যাবজ্জীবং মচ্ছ—মংসং ন খাদেয়্যং,

যো খাদেয়্য বজ্জং নং ফুসেয়্যাতি।

“আচ্ছা প্রভো! আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করুন, ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন মাছ মাংস ভক্ষণ করবে না। যে ভক্ষণ করবে তাকে অপরাধী হতে হবে।” এই নীতি নির্ধারণ কল্পে অনুরোধ করলে ভগবান তথাগত এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন না। আমিষ বা নিরামিষ ভোজনের জন্যে তিনি কাকেও বাধ্য করেননি। মানুষের আহার, দেশ, কাল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পারিবারিক সংস্কার ও ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর। অহিংসায় সার্বজনীন ধর্ম, দেশ, কাল ও পাত্রের গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা নিত্য নবাকারে গতিশীল। ভগবান তথাগত জীবক সূত্রে বলেছেন,

দিট্ঠং সুতং পরিসঙ্কিতং মচ্ছ মংসং ন খাদেয়্যং,

অদিট্ঠং অসুতং অপরিসঙ্কিতং তিকোটিক পরিসুদ্ধং

মচ্ছ মংসং খাদে তব্বং।

অসুত্তর নিকায়।

দৃষ্ট, শ্রুত ও পরিশুদ্ধিত মচ্ছ মাংস অপরিভোগ্য। অদৃষ্ট, অশ্রুত

অপরিশুদ্ধিত—এই ত্রিবিধ আকারে দোষ মুক্ত মাছ মাংস পরিভোগ্য। যদি দেখা যায় বা শুনা যায় যে আমার জন্যে প্রাণীহত্যা করে। কিম্বা আমাকে উপলব্ধ করে প্রাণীহত্যা করে এই মাছ মাংসে ব্যবস্থা করা হয়েছে—যদি এরূপ সংশয় উৎপন্ন হয়, তবে তে ক্ষেত্রে মাছ মাংস ভোজন না করাই বিধেয়। আর যদি দর্শন শ্রবণের গোচরাতীত হয় কিম্বা সংশয়ের যুক্তি সঙ্গত অবকাশ ন থাকে, তা হলে এই স্থলে ইচ্ছকের পক্ষে মাছ মাংস ভোজন অবিধেয় নহে। বস্তুতঃ অহিংসা জীবিত প্রাণীর প্রতি, মৃত বা মাংসের প্রতি নহে। হত্যার বিরুদ্ধেই বৌদ্ধধর্মের অভিযান, আহারের বিরুদ্ধে নয়।

অহিংসা ও আমিষের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গতি বিধান সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে দুঃসার্য। চিন্তার বিষয় হচ্ছে জীবে ও মাংসে পার্থক্য কিরূপ? তৎসম্পর্কে বুদ্ধি-বাদীর বিচার বুদ্ধি যথেষ্ট। অঙ্গুত্তর নিকায় উক্ত হয়েছে—

পাণাতিপাতে ভ্রতুণা সম্পযুতো হোতি, পরং,

সমাদপেতি, সমনুক্রো হোতি, বন্নং ভাসতি।

অঙ্গুত্তর নিকায়।

সাধারণতঃ চার প্রকারে হত্যার জন্য দায়ী হয়প্রাণী। হত্যায় স্বয়ং নিযুক্ত হয়, পরকে নিয়োগ করে, হত্যার সমর্থন করে এবং হত্যার প্রশংসা করে। ক্রেতা ও ভোক্তা উক্ত চার প্রকারে সংশ্লিষ্ট না হয়েও স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে। যদি কেহ পূর্বোক্ত কারণের মধ্যে যে কোনটিতে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তবে সে নিমিত্ত কর্মের ভাগী হবে। নচেৎ মাছ মাংসভোজী মাত্রই নিমিত্ত কর্মের ভাগী এরূপ আরোপ করা অবাস্তব ও অযৌক্তিক। সাধারণ যুক্তিতেও বলা যায় যে, যার কায়-মনো-বাক্যের সঙ্গে বধ ক্রিয়ার কোনরূপ সম্পর্ক না থাকে, সেই সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির হিংস

কিরূপে হবে এবং বধের জন্য সে দায়ীও বা হবে কেন? সাধারণতঃ ভোজন কৃত্য লোভের দ্বারা সম্পন্ন। হত্যাক্রিয়া কিন্তু লোভ চিন্তের নহে। ইহা সম্পূর্ণ দ্বৈষমূলক চিন্তের কার্য। বধ চেতনায় লোভ মনোবৃত্তি থাকতে পারে না। লোভ উপলক্ষ্য (উপ-নিস্‌সয় পক্ষয়) রূপে পূর্বাপর চিত্তরূপে বিদ্যমান থাকতে পারে। সুতরাং হিংসা হত্যা না করেও আমিষ ভোজন করা যায়। পক্ষান্তরে ভোজন না করেও হিংসার জন্যে দায়ী হতে পারে। পাহাড়ের ধারে শস্যক্ষেত্র বন্য বরাহ বরাবর শস্য নষ্ট করে। একদা মালিক ফাঁদ পেতে শত্রু নিধন করল। মালিক ছিল মুসলমান। ইসলামে বরাহ মাংস নিষিদ্ধ। তাই মৃত বরাহ বন্ধুকে দিয়ে দিল। বন্ধু যথেষ্ট পরিমাণ মাংস নিজে রেখে তার অন্য বন্ধু বান্ধবের মধ্যে বিতরণ করল এবং অবশিষ্ট মাংস বাজারে বিক্রয় করল এক্ষেত্রে হিংসা জনিত অপরাধ কার হল? মাতাপিতা নিরামিষাশী, কিন্তু স্নেহ-পুতিম পুত্র মাছ মাংসাহারে উৎসাহী। তজ্জন্ম সর্বপ্রকার আয়োজন পুত্রের তৃপ্তি মিটানোর জন্য করে থাকে। নিবোধ পুত্রের আহায়েই আমোদ। পূর্বাপর সে কিছু জানে না। এক্ষেত্রে অপরাধ কি নিরামিষাশী মাতা-পিতার—না—আমিষ ভোজী পুত্রের? মহাত্মা গান্ধীর জীবন বধের সঙ্গে নাথুরামের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ আর ষড়যন্ত্রকারীগণের সম্পর্ক অপ্ৰত্যক্ষ। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকলে সমান দায়ী। অতঃপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু প্রভৃতি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করলেন কিন্তু জীবন বধের দায়িত্বে কোন পুন্নই উঠল না।

প্রকৃত প্ৰস্তাবে প্রাণী হিংসা বিরতিই প্রকৃত অহিংসা। হিংসা বিরতি উৎপাদনের জন্য মানুষকে মানসিক কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। নিত্য নীরব যুদ্ধে নিরত থাকতে হয়। হিংসা হত্যা করার চেয়ে না করাই যে বিরাট মানসিক শক্তির পরিচয়। বিরতিকে

সাধারণতঃ আমরা কাজ বলে জানি না। কারণ এটার বহিঃবিকাশ বিরল। হিংসা হত্যা অতি অনায়াসে কান্ন-বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে লোক চক্ষুর গোচরে আসে কিন্তু হিংসা বিরতির পূর্ণদীপ্তি ও অসীম শক্তি অন্তরেই নিহিত এবং সর্বোত্তমভাবে গুপ্ত থাকে। তথাগতের আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যেই এই অহিংসা বা মৈত্রী-করুণা পূর্ণত্ব লাভ করে মূর্তিমান হয়েছে। জগতের প্রতি তার মৈত্রী-করুণার প্রভূত প্রাচুর্য জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের মত সর্ব লোকের উপর নিবিশেষে বর্ষিত হয়েছে।

সাধনার অন্তরায় ও অনুকূল পরিবেশ

এখন দেখা যাক কিরূপে ব্রহ্ম-বিহার ভাবনা করতে হয়। এটার প্রণালীই বা কিরূপ? পূর্বকৃত্যই বা কি? আনুকূল্য ও প্রতিকূল্যই বা কি?

প্রথমতঃ ভাবনাভিলাষীকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে তাঁর জীবনের ভাবনাময় অগ্রগতির পথে বিরুদ্ধ ধর্মের প্রভাব আছে কিনা। বিরুদ্ধ ধর্মের প্রভাব বলতে শাস্ত্রোক্ত পাঁচ প্রকার অন্তরায়কর ধর্মকেই বুঝতে হবে। সংক্ষেপতঃ—অন্তরায় পাঁচ প্রকার—ক্লেশ-স্তরায়, বিপাকান্তরায়, কর্মান্তরায়, অজ্ঞাতিক্রান্তরায়, ও উপবাদান্তরায়। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, সন্দেহ, স্তান, ঔদ্ধত্য, অহী, (লজ্জাহীনতা) ও অপহ্রস্ব (ভয়হীনতা) এই দশবিধ ক্লেশ থেকে উৎপন্ন হয় বলে অহেতুকদৃষ্টি, অক্রিয়াদৃষ্টি ও নাস্তিক দৃষ্টির নাম ক্লেশান্তরায়। অন্তরের ক্লেশের প্রাবল্যহেতু মানুষ মনে করে এজগতে স্বাবর-জন্ম, সম্পদ, যতপ্রাণী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি জাগতিক সর্ব পদার্থের সৃষ্টির মূলে কোন হেতু নেই, প্রত্যয় নেই।

কোন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তিতেই সর্ব পদার্থের সৃষ্টি ও বিলয় ঘটে থাকে। হেতু এবং প্রত্যয় সম্পর্কে অবিস্থাস সূচক ধারণাকে অহেতুক দৃষ্টি বলে। মানুষ মনে করে—এজগতে দান, শীল ও ভাবনা বলতে কোনরূপ কুশল কর্ম কিম্বা প্রাণী হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, নেশাপান বলতে কোনরূপ অকুশল কর্ম নেই। কুশলাকুশল কর্মের ফল বলতে কিছু নেই। যা কিছু করা যায়—করার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যায়। সংক্ষেপে—কর্ম ও ফলে অবিস্থাস সূচক এরূপ ধারণাকে অক্রিয় দৃষ্টি বলে। মানুষ মনে করে, ইহজন্মে কুশলাকুশল কর্ম করা হলেও ভবিষ্যৎ জন্মে সেগুলির কোন বিপাক ফলবে না। অতীত কর্মের কোনরূপ ফল বর্তমান জন্মে সংক্রামিত হয় না অর্থাৎ অতীত অনাগত জন্মে অবিস্থাস সূচক ধারণাকে নাস্তিক দৃষ্টি বলে। ক্লেণের অতিরিক্ত তারণায় মানুষের অন্তরে এরূপ ধারণা জন্মে।

অকুশল অহেতুক বিপাক “উপেক্ষা সহগত সম্তীরণ চিত্ত”। কুশল অহেতুক বিপাক—“উপেক্ষা সহগত সন্তরীণ চিত্ত” এবং কামাচর শোভন চিত্তের চার প্রকার জ্ঞান বিপ্রযুক্ত দ্বি-হেতুক বিপাক চিত্ত,—এই ছয় প্রকার বিপাক চিত্তের অন্যতম চিত্তে যাদের জন্ম—তাদের পক্ষে ইহ জীবনে উন্নত জ্ঞান বা মার্গফল লাভ সম্ভব নহে বলে তারা বিপাকান্তরায়।

মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অহংহত্যা, দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধের দেহ হতে রক্তপাত ও সঙ্ঘভেদ—এই সকল কর্ম-স্বগ-মোক্ষের বিঘ্ন বলে তারা কর্মান্তরায়। বিনয় শাস্ত্রে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর জন্য আদেশ-নিষেধ সূচক যে সকল নীতি উদ্ধৃত আছে,—তা লঙ্ঘন করাকে অজ্ঞাতিক্রমান্তরায় বলে। মাতা-পিতা, আচার্য-উপাধ্যায়, গুরুস্থানীয় শীলবান ধার্মিক লোকের প্রতি বিশেষ করে আর্ষ পুরুষের প্রতি নিন্দা, অপবাদ করা

উপবাদান্তরায় । এই সবল কর্ম সাধনার বিঘ্ন স্বরূপ । যার জীবনে অন্তরায়কর কর্মের প্রভাব নিহিত আছে তার সাধন পথে প্রগতি অসম্ভব । এই জন্য তারা অন্তরায় বা আবরণ নামে অভিহিত । ভাবনা-প্রয়াসীর জীবন এসকল অন্তরায় থেকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ মুক্ত কিনা তা লক্ষ্য করার বিষয় । অন্তরায়গ্রস্ত হলে সাধন পথে অগ্রগতি পদে পদে ব্যাহত হয় । পক্ষান্তরে সর্ববিধ অন্তরায় মুক্ত হয়ে ভাবনা-ব্রত গ্রহণ বিধেয় । তাতে অনায়াসে সাফল্য লাভের সমাধিক সম্ভবনা । আর প্রতিকার সাপেক্ষ অন্তরায় গুলোকে পূর্বেই সংশোধন করে নিতে হবে । প্রতিকারাতীত অন্তরায় থাকলে, সকল প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হবে । কাজেই উদ্দেশ্যের সাফল্য লাভের পক্ষে সকলদিকে আনুকূল্য বিবেচনার পর ব্রত গ্রহণ বাঞ্ছনীয় ।

সাধনা ব্রত গ্রহণকারীকে পূর্ব করণীয় রূপে লক্ষ্য করতে হবে যে তিনি কতদূর দক্ষ, সরল, অকুটিল, অনুগত, বিনয়ী ও নিরভি-মানী । কারণ মানুষ যদি বিচক্ষণ হন, তবেই তিনি সরল থাকতে পারে । দক্ষতাপূর্ণ সরলতার মধ্যেই সকল শক্তি নিহিত থাকে । কুটিলতার মধ্যে সারল্যের পরিচয় যেমন থাকে না তেমনি দক্ষতার পরিচয়ও থাকে না । এসব গুণের সাথে সংযুক্ত থাকতে হয় আনু-গত্যের । মাতাপিতা, আচার্য-উপাধ্যায় ও নিয়ম-শৃঙ্খলা সকল ক্ষেত্রেই আনুগত্য মহোপকারী । অবাধ্যতার ন্যায় এত বড় অভিশাপ, বাধ্য-তার ন্যায় এতবড় সৌভাগ্য মানুষের জীবনে আর হয় না । অনু-গত হলেই তার মধ্যে থাকে বিনয়, —নম্রতা, থাকে নিরভিমানতা । তার অন্তরে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় সন্তোষ পরম ধনকে রক্ষা করতে হয় । যদি অন্যের পোষা হন তাকে ভরণ পোষণ করতে দায়কগণের যাতে কোনরূপ বেগ পেতে না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার । বহু কর্ম ব্যস্ততা ও ভাবনার পক্ষে শুভ নহে । মানসিক উদ্ভিগ্ন-

তার জন্য সাধনায় মন একাগ্র হয়ে উঠতে পারে না, কাজেই নানা কর্মের বাস্তবতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। লাভ সৎকারের আকাঙ্ক্ষায় ভাবনার অন্তরায় হয়। সেজন্য সবসময় অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ভাবনাকারী সর্বদা শান্ত-স্বভাব, বুদ্ধিমান, মিতভাষী হবেন। গৃহস্থ দায়কগণের প্রতি অনাসক্ত ভাবে জীবন যাপন করবেন। কায়-মনো-বাক্যে এমন কোন আচরণ করবেন না যাতে অপরাপর বিত্ত পুরুষেরা নিন্দা করতে পারেন।

শারীরিক মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত যোগ সাধককে আহালাদি কৃত্য সমাপন করে জন-মানব-শূন্য স্থানে সুখাসনে উপবেশন করতে হবে। কাম, ক্রোধ, হিংসা - বিদ্বেষের নানাবিধ কুফল দুঃখপূর্ণ পরিণতি চিন্তা করতে হবে। আবার ক্ষমা, মৈত্রী করুণার অপরি-সীম গুণ মহাত্মা স্মরণ করতে হবে। অতঃপর হীতি প্রমোদিত চিত্তে আরো চক্ষা করতে হবে যে সম্যক সমুদ্র; প্রত্যেক বুদ্ধ ও অনুবুদ্ধগণ সাধনা পুভাবেই সংসার দুঃখের অবসান ঘটাতে ও পরমা শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। “আমি আজ যে করুণাঘন মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাধন-সময়ে অবতীর্ণ হব। সেই তথাগতগণের অসীম শান্তি, অপার মৈত্রী-করুণা অনন্ত গুণা-বলী এরূপ সাধনা পুভাবেই অর্জিত হয়েছিল। ধ্যান, জ্ঞান, পরমা শান্তি নিরুত্তী লাভের একমাত্র পন্থা-এই সাধনা। জীবন দুঃখের অবসান ঘটাবার জন্যই আজ আমি চরম সুখের সন্ধানে চলছি। আমার এ যাত্রা কিছুতেই যেন ব্যাহত না হয়।” এরূপ উচ্চ চিন্তা ধারার প্রাধান্য চিত্ত চাকলা যখন দূরীভূত হবে এবং চিত্ত সাম্যভাব প্রাপ্ত হবে তখন সুচিন্তিত নিয়মতান্ত্রিক বিধানে অগ্রসর হতে হবে। সক্রিয় ভাবে ব্রতোদ্যাপন আরম্ভ করার পূর্বে লক্ষ্য করার অপরি-হার্য আরেক বিষয় হচ্ছে ব্যক্তি বিশিষ্টতা ও ব্যক্তিভেদ।

মৈত্রী সাধনার উপলক্ষ্য ব্যক্তিবর্গ

সাংসারিক সম্পর্ক প্রাণীপণ চার শ্রেণীতে :— বিভক্ত প্রিয়, অপ্রিয়, মধ্যস্থ ও শত্রু । এই চতুর্বিধ ব্যক্তির প্রতি প্রথমতঃ ভাবনা পোষণ অবিধেয় । সাধারণতঃ মানুষ আত্ম-পরায়ণ, আত্ম-সর্বস্ব । নিজের প্রতি যে প্রেম, প্রীতি অপরের প্রতি তা থাকা সম্ভবপর নহে । আজন্ম কাল পোষিত স্বার্থপরতা পরার্থে হঠাৎ বিসর্জন দেওয়া অতীব কষ্ট সাধ্য । জগতের প্রতি শুভেচ্ছা প্রনোদিত চিত্তে মৈত্রী করণার অনুশীলন করতে গেলে দেখা যায়—প্রিয়জনের দর্শনে, প্রিয় জনের বাক্য শ্রবণে মানসপটে আনন্দে ভরে উঠে । আনন্দের আতি-শয্যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয় । ঐদিকে প্রিয়কে মধ্যস্থ ভাবতে গেলেও মনে বড় কষ্ট বোধ হয় । প্রিয় ব্যক্তি অপ্রিয় কিম্বা শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে দাঁড়ালেও দুঃখের অন্ত থাকে না । অপ্রিয়ের প্রতি প্রীতি জন্মান, মৈত্রী পোষণ আরেক দুঃসাধ্য ব্যাপার । অপ্রিয়কে প্রিয় করতে সাতিশয় শ্রান্তি আসে, প্রাণে মানতে চায় না । মধ্যস্থকে সহসা প্রিয় করতে গেলেও অসহ্য বোধ হয় । আবার শত্রুর স্মৃতি অনুধাবন মাত্রই অন্তরে ঘ্রেশের সৃষ্টি হয় । পুচু ক্রোধের সঞ্চার হয় । মননশীলতার দিক দিয়ে এই সব ব্যাপার অত জটিল সমস্যা । সুতরাং এই চার প্রকার ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে প্রথমতঃ মৈত্রী ভাবনা করতে নেই । আর লিঙ্গ বিপরীতের প্রতি মৈত্রী ভাবনা নিতান্ত অনুচিত । কারণ জনৈক আসঙ্গ প্রিয় অমাত্য-পুত্র কুলোপদেশটা ডিঙ্কুকে জিজ্ঞেস করে নিলেন যে প্রিয় ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে মৈত্রী ভাবনা করা উচিত । স্ত্রৈণ অমাত্য-পুত্র মনে করলেন এ জগতে একমাত্র স্ত্রী-ই প্রিয় । কাজেই আপন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে ভাবনা করলেই তো হয় । এই চিন্তা করে স্ত্রীর স্মৃতি অনুসরণে মৈত্রী ভাবনা শুরু করলেন । ভাবনা যত গার হতে লাগল, স্ত্রীর স্মৃতি

তত হৃদয় পটে গভীর হতে গভীরতর হতে আরম্ভ করল। এভাবে ভাবনা করতে করতে স্ত্রীকে স্বয়ং সাক্ষাৎ পেতে ইচ্ছে করলেন, কিন্তু পেলেন না। তিনি ছিলেন একটি আবদ্ধ কামরায় উপবিষ্ট। দার গমনের অভিপ্রায়ে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য উদ্যত হয়েও দরজা ঠিক করতে পারলেন না। অবশেষে দেওয়াল ভেঙ্গে বের হবেন বলে সারারাত্রি অনঙ্গদেবের সহিত সংগ্রামে রত রলেন। সুতরাং লিঙ্গ বিপরীতের প্রুতি ভাবনা করলেও সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। নঃচৎ দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টির সম্ভাবনা। যেহেতু এতে মৈত্রী অপেক্ষা কামাধিকোর সমাবেশ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিকতর। মৃত ব্যক্তির জীবনের অস্তিত্বের অবিদ্যমানতা -হেতু আর তৎপ্রুতি মৈত্রী ভাবনা কার্যকরী নহে। যার প্রুতি মৈত্রী পোষণ করা হবে, সে যদি ইহলোকে জীবিত না রইলো-তবে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা হবে কার উপর? অতএব মৃত ব্যক্তির প্রুতিও মৈত্রী ভাবনা অবিধেয়।

যোগীকে সর্বপ্রথম নিজের বিষয় চিন্তা করতে হবে এবং আপনার মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে।

সব্বদিসা অনুপরিগম্ম চেতসা নেবজ্জ্বগা পিতর মত্তনা ক্বচি,
এবং পিযো পুত্তা অত্তা পরেসং তম্মা ন হিংসে পরং অত্তকামো'তি।

মানুষ ভিতরে বাইরে পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখে ন্যায়-অন্যায়ে নিজেকে যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে, পরকে সেরূপ অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। আবার নিজকে স্পষ্টভাবে না জেনে অপরকে জানাও সম্ভব নয়। নিজকে জানাই যে সকল তত্ত্বের মূলভিত্তি। শাস্ত্রে নিজের প্রতি যথাথ দর্শনই আত্ম-দর্শন নামে বর্ণিত। জাগতিক প্রত্যেকটি ঘটনায় আপন বিবেক বুদ্ধিই আপনার জীবনে প্রকৃত সাক্ষী। ছলনা বাহিরে সর্বত্র চলে, কিন্তু আপনার বিবেককে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য কারো ধরে না। তাই বিবেক-বুদ্ধি শাসিত আপনার অন্তরকে সাক্ষী করে জগতের সর্বদিক অনুসন্ধান করলে যেমন

আপনার অপেক্ষা প্রিয়তর কাকেও পাওয়া যায় না; তেমন প্রত্যেবে
জীবন-সত্তা প্রত্যেকের কাছে সর্ববস্তু ও ব্যক্তি অপেক্ষা প্রিয়তম
আত্মতুল্য ব্যক্তি বা বস্তু জগতে বিরল। কেউ যদি অপেক্ষাকৃত কাকে
স্নেহ-দমছ করে থাকে; তবে বলতে হবে—তাও তার নিজের চরি
তাথতার জন্য।

নথি অন্তঃসমং পেমং

কিন্তু নিজের হিত-সুখের কামনাই মানবতা বা বিশ্ব মৈত্রীর
উদ্দেশ্য নয়। মানবতার বিস্তারে অন্যের সুখ-শান্তির বাঁঘাত করে
আপনার সুখ-শান্তি আহরণ করতে গেলে পরিণতিতে আপনার
দুঃখ, অশান্তিই লাভ হয়। আপনার আপাতঃ সুখ-শান্তি বিসর্জন
দিয়ে অন্যের হিত-সাধনে তৎপর হলে আপন সুখ-শান্তি গড়ে
উঠে। সংক্ষেপতঃ পর-সুখ বিধানের উপর আপনার সুখ এবং পর-
দুঃখ ঘটানোর উপর নির্ভর আপনার দুঃখ। কাজেই দূরদর্শী মানব
মানুষই সম্মুখের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে ভবিষ্যতের বৃহত্তর স্বার্থের
প্রত্যাশা করে থাকেন। আপনার সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় শত বৎসর
ব্যয় করলেও যখন কেহ শান্তি সুখের অধিকারী হতে পারে না; বরং
এতে স্বার্থপরতার জঘন্যতাই বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন এরূপ হীন
স্বার্থের চরিতার্থতায় কি লাভ? সর্বাপ্রে নিজের বিষয় চিন্তার প্রয়োজন
ও উদ্দেশ্য— এই জন্য যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করা নয়, নিজেকে সাক্ষী
স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে নিজের তুলনায় জগতকে বুঝবার জন্য। যেহেতু
স্বার্থপরতা ও মৈত্রী-করুণার সাধনা এক নয়, বরং দুই বিভিন্ন
বিপরীত দিক। স্বার্থপরতা মানুষের অন্তরকে সঙ্কুচিত ও হীন করে।
সর্ববিধ উৎকর্ষের হেতু প্রত্যেকে উপলব্ধি করতে দেয় না। অন্য
পক্ষে মৈত্রী সাধনা মহত্ব ও অসীমত্ব প্রদান পূর্বক অন্তরে আলোক
পাত করে। যদ্বারা সাধক তার গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে
তুলতে পারেন; যেহেতু স্বার্থে পরার্থ কিম্বা পরমার্থে কিছু থাকে না,

কিন্তু পরার্থে স্বার্থ-পরমার্থ দুই থাকে। অতএব আত্মোন্নতিকামী
কদাচ আত্ম-তুল্য কাকেও হিংসা করবে না, সংহার করবে না।

যদা মম পরেষাং চ তুলামেব সুখং প্রিয়ং।

তদাত্মনঃ কো বিশেষো যেনাত্তৈব সুখোদ্যমঃ ॥

বোধিচর্যাবতার ৮/৯৫

আমার নিকট আমার সুখ যেমন প্রিয়, অন্যের সুখ তার নিকট, তেমন
প্রিয়। অতএব অন্য হতে আমার প্রভেদ কোথায়? যাতে কেবল
আমার সুখের জন্যই চেষ্টা করব। মহাভারতকার বলেন—

জীবিতুং যং স্বয়ং চেষ্টেৎ কথং সোনাং-প্রথাতয়েৎ।

যদ্ যদাত্মনি চেষ্টেৎ তৎ পরস্যপি চিন্তয়েৎ ॥

যে নিজের বাঁচতে ইচ্ছা করে, সে কেমন করে অন্যকে গীড়া দিবে,
হত্যা করবে বা করাবে? নিজের জন্য যা ইচ্ছা করবে, পরের জন্য
তাই ইচ্ছা করবে। আপন জীবনের মর্যাদা যাদের নিকট প্রখর
ও দীপ্ত তারাই পর জীবনের দরদ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। আপন
জীবনে মর্যাদাহীন ব্যক্তি লোভ-দ্বেষ্টের তাড়নায় অন্যের জীবন-হানি
ঘটায়। নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যকে ছোট জান করে।
বস্তুতঃ আত্মোন্নতিকামী পরের সহিত সাধন করতে পারে না।
পরের অহিত চিন্তা যে আত্মোন্নতির অন্তরায়। পরহিত কামনা
অপরের সন্তোষ লাভ আত্মোন্নতির পরম সহায়ক। উচ্চাত্মের ধর্ম-
জ্ঞান লাভের জন্য যত প্রকার উপায় আছে—মৈত্রী তাদের প্রধান ও
প্রথম নিদান। জীবনোৎকর্ষের শীর্ষস্থানে অধিকার হওয়ার যেই সোপান
তার প্রধান ধাপই হল মৈত্রী বা সর্বপ্রাণীর প্রতি হিত-ভাব পোষণ।
মৈত্রী ভাবনাকারীকে সুশীল, দৃঢ়চেতা ও ত্যাগ প্রবণ হতে হবে।
সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ-পরায়ণ ব্যক্তির সংসর্গ পরিত্যাগ করে চলবেন।
মৈত্রীর মহান উদার পথে যাঁরা অগ্রসর হন, তারা পরম শত্রু
ভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও শত্রু মনে করেন না বরং তাদের সহিত মিলোচিৎ

ব্যবহার করে তাদের হৃদয় রাজ্যে বিজয়াসম প্রতিষ্ঠা করেন।
মৈত্রী পরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা অকুতোভয়, নিরাতঙ্ক সর্বত্র নিরাশঙ্ক
চিত্তে বিচরণ করেন। পরদুঃখ দর্শনে অধীর ও পরদুঃখ মোচনে
ব্যাকুল হন।

আমরা জাতক পাঠে জানতে পারি যে, উগরান তথ্যগত জৈতবনে
যখন অবস্থান করছিলেন, তখন কোশলরাজ একদিন রাত্রিকালে
চারজন নারকীয় প্রাণীর চারটি আর্তনাদ শুনতে পেলেন। এই
প্রাণী চতুর্ভুজ নাকি অতীত জন্মে শ্রাবস্তী নগরে ব্যক্তিচার করত।
তার ফলে এরা লৌহকুন্তী নরকে পড়েছিল। অসহ্য নরক যন্ত্রণায়
মহাশব্দে আর্তনাদ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু শব্দগুলোর পূর্ণাঙ্গ
উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়নি। তজ্জ্ববনে কোশলরাজ নরগভয়ে ভীত
হয়ে বিন্দ্র রাত্রি যাপন করেন। পরদিন সকালে ব্রাহ্মগণ রাজ-
সকাশে উপস্থিত হলেন এবং কুশলাদি প্রশ্ন উত্থাপন করলে রাজা
উত্তর দিলেন—“প্রিয় মহাশয়গণ আমার ভাগ্যে কুশল কোথায় ?
গভীর রাতে চারটি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনেছি, কি জানি, এতে কি
অমঙ্গলই না হয় ? ইহা শুনে ব্রাহ্মগণ ভাবলেন—এই-ই সুযোগ।
এ সুযোগে যদি কিছু করা যায়। ব্রাহ্মগণ রাজাকে সান্তিগম্য ভয়
প্রদর্শন করে বললেন :—“মহারাজ ! এ শব্দগুলো অতি ভীষণ, এতে
আপনার জীবন রাজ্য ও প্রজাগণের বড় অমঙ্গল সূচিত হয়। অচিরেই
রাজ্যে মহা অমঙ্গল সুনিশ্চিত। তবে এগুলো যত বড় অমঙ্গল সূচকই
হোক, তা অপ্রতিবিধেয় নহে। আমরা সর্ব-চতুষ্ক যজ্ঞ সম্পাদন করে
আপনার যাবতীয় অমঙ্গল দূর করতে সক্ষম হব। রাজা এতে
আশ্বস্ত হয়ে যজ্ঞের আয়োজনে আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মগণ সোম্বাসে
যজ্ঞের জন্য যা যা আবশ্যক সব কিছুর আয়োজন করলেন। যজ্ঞ
স্থলীতে অসংখ্য খুঁটি পুতুলের এবং তাতে প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর
চার চারটি করে যজ্ঞের জন্য অসংখ্য প্রাণী বেঁধে রাখলেন। পুরো-

পুরোহিতগণ বহু মাহ মাংস ভোজন ও বহু ধন—ধান্য লাভ করার আশায় অতিমাত্রায় আনন্দিত হলেন। এটার প্রয়োজন, সেটার প্রয়োজন বলে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলেন।

এদিকে কোশল-রাণী মল্লিকা দেবীর পরামর্শে রাজা জেতবনে সর্বত্র বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত রত্নমত অবগত করলেন। সব শ্রবণ করে তথাগত অভয় প্রদান করে রাজাকে বললেন—“মহারাজ নারকীয় প্রাণীরা নরক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আর্তনাদ করতে আপনি শুনতে পেয়েছেন। তবে আপনার কিছুমাত্র ভয় নেই। এতে আপনার জীবনের, রাজ্যের কিছা প্রজা-বৃন্দার কোনরূপ অমঙ্গল সূচিত হয় না। আপনি নিরীহ অজস্র প্রাণী-হত্যা করে যত সম্পাদন পূর্বক উৎকট পাপ সঞ্চয় করবেন না। মৃত বন্দীত সকল প্রাণীকে আজই বন-বনান্তে ছেড়ে দিবার ব্যবস্থা করুন।”

এরূপে করুণার মঙ্গলমূর্তি বুদ্ধের কথায় কোশলরাজ অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের সকল প্রকার আয়োজন রহিত করে অজস্র প্রাণী-হত্যা নিবারণ করলেন। এতে ব্রহ্মগণগণ সর্বহারা বাস্তির ন্যায় পরাস্ত হলেন। এরূপে তথাগত অসংখ্য প্রাণী-হত্যা নিবারণের উপলক্ষ্য হলেন।

পূর্বেও বলা হয়েছে যে আপন সুখ সমৃদ্ধি কামনা করা মৈত্রী সাধনার উদ্দেশ্য নয়। নিজকে উপমা শ্রমে বা সাক্ষী স্বরূপ রেখে যথাযথ ভাবে অপরের সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করার জন্যই সর্বাপ্রে আত্মানুধাবন। যথা :—

অহং অবেরো হোমি, অব্যাপজ্জো হোমি,
অনীঘো হোমি, সুখী অন্তঃনং পরিহরামি।

আমি বৈরী হীন হই, বিপদ শূন্য হই, দুঃখ শূন্য হই, সুখে

স্বাচ্ছন্দ্য স্বীয় জীবন যাপন করি। এরূপে আপনার জীবনের প্রতি ভাবনা করবেন। ভাবনার ধারা অবিরাম ভাবে রক্ষা করতে না পারলে প্রত্যাহ নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত ভাবে ভাবনার চর্চা করবেন। এই পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন মৈত্রী সাধনা অনুশীলনের ফলে অন্তর যখন দ্বিধা হীন, সঙ্কোচ হীন, মহান ঔদার্যে আপ্লুত হয়ে উঠবে, তখন ভাবনাকারীর অন্তর আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, অপর প্রাণী মণ্ডলীর সঙ্গে তুলনাত্মক প্রেরণার সঞ্চার হবে। তাঁর ধ্যান ধারণা সসীম গুণীবর্দ্ধিতা পরিত্যাগ করে বাহ্যিক অসীম প্রাণী জগতে বিস্ফারিত হবে। সাধকের অন্তরে পশ্চ জাগবে যে অসংখ্য প্রাণী গণের মধ্যে শুধু কি তাঁরই এই কামনা - না - প্রাণী মাত্রই এরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে থাকে? তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা যদি অপর সকল প্রাণীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমতুল্য না হয়, তবে তিনি বুঝতে পারবেন, উহা তাঁর জীবনে নিছক সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা। তিনি ইহাও বুঝবেন যে স্বার্থপরতা তো জীবনকে সঙ্কীর্ণ করে, নীচ হীন করে। উদার মহান হতে দেয় না। কিন্তু পরার্থপরতা মহত্ব লাভের ভিত্তি। ইহা মানুষকে পরার্থ ও পূর্ণত্ব দানে সক্ষম। কাজেই আপনাকে মহত্ব কিংবা মহাপুরুষত্বে উন্নীত করতে পরের মাধ্যমেই করতে হবে। পর-কল্যাণ চিন্তা ও পরহিতের কণ্ঠিপাথরে পরীক্ষা-তীর্ণ প্রাণই পয়ম পবিত্রতা মহাপ্রাণতা লাভের যোগ্য। অতএব সর্ব প্রমুখে আপন জীবনে পরার্থ কি বাহ্যিক-কোন ক্ষেত্রেই জীবের জীবন স্বতন্ত্র নহে। সবই পরকীয়। সবই পরতন্ত্র সমন্বিত। তাই বাংলা ভাষার কবি গেয়েছেন,—

“আপনারে লয়ে বিরত রহিতে

আসে নাই কেহ অবনী পরে,

সকলের তরে সকলে আমরা

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে”।

অসংখ্য জীবের অসদৃশ আকৃতি প্রকৃতি হলেও মূলীভূত গুণ, আন্তরিক
 আকাঙ্ক্ষা ও রুত্তি-প্ররুত্তিতে সর্বজীব সমতুল্য। সারক নিজের কথা
 এবার চিন্তা করবেন জগতের অসংখ্য জীবের মধ্যে আমিও একজন।
 আমি যা চাই জগতের সকলেই তা চায়, আমি যা চাই না, জগতের
 কেউ তা চায় না। সকলের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু এক। আমি রক্তমাংসে
 গঠিত, জগতের সকলেই সমধাতু দ্বারা গঠিত। আমার প্রতি শক্রতা
 আচরণে আমি যেমন দুঃখিত হই, সুখময় জীবিকার ব্যাঘাতে
 মনঃক্ষুব্ধ হই, বিপদে সন্তপ্ত ও অধীর হই, জরা ব্যাধি দুঃখে স্নিগ্ধমান
 ও মরণ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হই, তেমনি জগতের সকল প্রাণী মিত্রতা,
 স্নেহ, মমতা, প্রেম, প্রীতি, নিরাপত্তা, শ্রী সম্পদ ইত্যাদি কামনা করে।
 শত্রুতা, অবিশ্বাস, অস্নেহ, ঘৃণা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কেহ কামনা করে না।
 আপনার পুত্র-কলত্র, আত্মীয় পরিজন নিয়ে আপন সম্পত্তিতে সুখ
 সম্মানের সহিত জীবন যাপন সকলেই চায়। নিন্দিত, অপমানিত,
 অবহেলিত, অপদস্থিত জীবন কেউ চায় না। সুতরাং সকল প্রাণীকে
 আত্মবৎ মনে করে কারো প্রতি হিংসা করবেন না, নির্দয় হবেন না।
 কাকেও আঘাত করবেন না। হত্যা করবেন না বা করাবেন না।
 তথাগত কতক শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে—

যস্ স পানে দয়া নথি তং জঞ্জ্ঞা বসনো ইতি।

যার প্রাণে প্রাণীর প্রতি মৈত্রী করুণার অভাব, তাকে সকলে চণ্ডাল
 বলে জানবে।

অতপর যারা প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরব-পাত্র, শ্রদ্ধাস্পদ, তাঁদের
 প্রিয় বাক্য, দান, শীল, সমাধি ও মাহাত্ম্য স্মরণ করে ভাবনা
 করবেন। যেহেতু নিজের পরেই প্রিয় ব্যক্তির স্থান।

অহং বিষ় আচারিষ্পজ্জ্বাষো মাতা পিতরো হিতসত্তা,
 মজ্জন্তিক সত্তা, বৈরী সত্তা, অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জ্বা
 হোন্ত, অনীষা হোন্ত, সুখী অন্তানং পরিহরন্ত, দুক্খা
 মুঞ্চন্ত যথা-লদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্ত কামমস্ সকা।

আমার ন্যায় আচার্য, উপাধ্যায়, মাতাপিতা, ভাইবোন, আত্মীয়-
স্বজন, হিতকামী, মধ্যস্থ—এমন কি অহিত মার্গান্বেষী, শত্রু ভাবাপন্ন
প্রাণীগণ শত্রুহীন হোক, বিপদ শূন্য হোক, দুঃখ মুক্ত হোক, নিজ
নিজ জীবন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে যাপন করুক। উপদ্রব বিহীন হোক,
যথালব্ধ আত্মসম্পদ পরিভোগে বঞ্চিত না হোক। সর্ব জীব আপন
আপন কুশলাকুশল কর্মাধীন। তথাগত কর্তৃক বিভিন্ন গ্রন্থে উক্ত
হয়েছে—“হে ভিক্ষুগণ! কি প্রকারে ভিক্ষু বা ভাবনাকারী মৈত্রীচিতে
একাধিক প্রসারিত করে ভাবনা করবে। প্রিয়বাস্তি যেমন তার
একমাত্র সুহৃদকে দেখে স্নেহে মমত্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠে, তদ্রূপ নিদিষ্ট
একেক দিকস্থ সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী চিত্ত উৎপাদন পূর্বক প্রীতি
প্রমোদ লাভ করবে”। তথাগত কর্তৃক প্রতিসম্ভিদা গ্রন্থে উক্ত হয়েছে :—

সৰ্বে সত্তা, সৰ্বে পানা, সৰ্বে ভূতা, সৰ্বে পৃগ্গলা, সৰ্বে
অন্তর্ভাব পরিযাপন্বা, সৰ্বা ইথিযো, সৰ্বে পুরিসা, সৰ্বে
অরিয়া, সৰ্বে অনরিয়া, সৰ্বে দেবা, সৰ্বে মনুস্সা, সৰ্বে
অমনুস্সা, সৰ্বে বিনিপাতিকা—অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জ্বা
হোন্ত, অনীয়া হোন্ত, সুখী অন্তানং পরিহরন্ত, দুক্খা মুঞ্চন্ত
যথালব্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্ত কামস্সকা।

অর্থাৎ জগতের সমস্ত সত্ত্ব, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত ভূত, সমস্ত পৃগ্গল,
সমস্ত দেহধারী জীব, সমস্ত স্ত্রী, সমস্ত পুরুষ, সমস্ত আর্য অনার্য, সকল
দেব, সমস্ত মনুষ্য, সমস্ত অমনুষ্য, সকল নিরয়গামী জীব শত্রুহীন হোক,
বিপদশূন্য হোক, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুক, যথালব্ধ সম্পত্তি
পরিভোগে বঞ্চিত না হোক, জগতের সর্ব প্রাণী নিজ নিজ কর্মাধীন।

মৈত্রী সাধনার মতঃ ফল

“ধম্মপদ” গ্রন্থে উক্ত হয়েছে :

মেত্তাবিহারী যো ভিক্ষু পসম্মো বুদ্ধ সাসনে,
অধিগগ পদং সত্ত্বং সত্ত্বারুপমং সুখং।

যে ডিঙ্কু মৈত্রী সাধনায় নিবিষ্ট, সর্বদা বুদ্ধোপদেশের প্রতি শ্রসন হয়ে তার অনুশীলনে নিরত তিনি সংস্কার উপশম জনিত সুখময় শান্তপদ লাভ করবেন। সঙ্কীর্ণ সংস্কারের গভীবদ্ধতা এড়িয়ে অসীম মুক্তাঙ্গনে বিলীন হয়ে অবস্থান করবেন। মনে পড়ে কবি গুরুর বিশাল চিন্তাধারার কথা। একসময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নৌকায় অবস্থান করছিলেন, সেখানেও তাঁর সাধনার বিরাম ছিলনা। গভীর রাত্রি পযন্ত নৌকার ভিতর দীপালোকে লিখন পঠন চলছিল। এমনি জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রাতে পঠন ত্যাগ করে যখন সম্মুখস্থ প্রদীপ নিভিয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন, তখন তিনি দেখলেন—যতক্ষণ নৌকায় ক্ষীণ প্রদীপটা জ্বলছিল, ততক্ষণ অনন্ত চন্দ্রালোক নৌকায় প্রবেশ করতে পারেনি। ক্ষীণপ্রভা দীপটা নির্বাপিত হওয়া মাত্রই চারদিক থেকে অনন্ত আলোকচ্ছটা এসে নৌকায় প্রবেশ করল এবং নৌকাখানি উদ্ভাসিত করে ফেলল। কবিগুরু ডাবলেন—এইরূপই তো যতদিন মানুষের মানস পবাবৃত সঙ্কীর্ণ সংস্কার নিরবশেষ নিরসিত না হবে, ততদিন প্রাকৃত জনগণ কৃপমণ্ডুক সদৃশ সংস্কার জাত স্বার্থপরতায় ঘৃণিপাক খাবে মাত্র। আর যখন হীন গভীবদ্ধ স্বার্থপরতা পদমদন পূর্বক চিত্ত অনন্ত প্রাণীর হিতকামনায় উদ্ধুদ্ধ ও বিস্তীর্ণ হয়ে পড়বে তখন সঙ্কীর্ণতা নামে কিছু থাকবে না। বিশ্ব ব্যাপী চিন্তাশীলতার মধ্যে বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি সমপ্রাণতা ও সমদর্শিতা এসে সঞ্চিত হবে। তাতেই সর্ব সংস্কারের বন্ধন কেটে মহান মুক্তির অবকাশ গড়ে উঠবে। মৈত্রী সাধনার সাধারণ ফল বর্ণনা করতে গিয়ে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে—

সুখং সুপতি সুখং পটিব্জ্জ্বতি, ন পাপকং সুপিনং পস্‌সতি,
 মনুস্‌সানং পিযো হোতি, অমনুস্‌সানং পিযো হোতি, দেবতা রুক্ষন্তি,
 নাস্‌স অগ্গিং বা বিসং বা সখং বা কমতি, তুবট্টং চিত্তং সমাধি-
 যতি, মুখবল্লো বিপ্পসীদতি, অসং যুস্বো কালং কয়োতি, উত্তরিং

অপ্পটি বিজ্ঞান্তো ব্রহ্মলোকুপ পঙ্কজীতি ।

মৈত্রী সাধক নিদ্রাবস্থায় সকল প্রকার উপদ্রব শূন্য সুখে নিদ্রা যান । গাত্রোথান কালে নিরুদ্ধেগে জাগরিত হন । ভয়াকুল পাপজনক দুঃস্বপ্ন না দেখে শুভকর্ম সুচক সুখ-স্বপ্ন দেখে থাকেন । তিনি মনুষ্য, অমনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, প্রেত দিগের প্রিয় মনোজ্ঞ হয়ে থাকেন । সকল বিপদ হতে দেবতাগণ তাঁকে পুত্রবৎ সতত রক্ষা করেন । মৈত্রী ভাবনাকারীর কায়ে অগ্নি স্পর্শিত হয় না । অস্ত্রসাস্ত্রের আঘাত কিম্বা বিষ দক্ষ শর নিক্ষেপ বা গুলি বর্ষণ করা হলেও শরীরে পশে না । যোগ সাধনায় চিত্ত অতি শীঘ্র একাগ্র সমাহিত হয় । মুখবর্ণ সর্বদা উজ্জ্বল প্রসন্ন থাকে । মৈত্রী পরায়ণ ব্যক্তি মৃত্যুকালে মৃত্যুতা কঠিন পীড়া কিম্বা মোহগ্রস্ত হন না । মৈত্রী ভাবনা প্রভাবে যদিও অহং নামক চরম জ্ঞান লাভে সক্ষম না হন, ইহজীবন হতে চ্যুত হয়ে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়া তাঁর সুনির্ধারিত । এরূপে মৈত্রী করুণার অসীম গুণ বর্ণনা করা হয়েছে । মৈত্রী পরায়ণ ব্যক্তি শরাঘাত হয়েও সে আঘাতকারীর প্রতি মৈত্রী পোষণ করেছিলেন এবং পরে দৈবানুগ্রহ লাভ করে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছিলেন । এক্ষেত্রে সেরূপ একটি গল্প প্রণিধান যোগ্য :—

পুরাকালে বারাগসীর সমীপবর্তী কোন এক নদীর উত্তর তীরে দুই নিষাদ অধ্যুষিত গ্রাম ছিল । দুই গ্রামের দুই মোড়ল পরস্পর বন্ধু ভাবাপন্ন । কালক্রমে তাদের এক গৃহে একটি পুত্র, অপর গৃহে একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে । এদের নাম রাখা হয় যথাক্রমে দুকূল ও পারিকা । পূর্ণ বয়সে সংসার ধর্মের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে দুকূল ও পারিকা এতে নারাজ হন । তথাপি তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভিভাবকগণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন । এদিকে তারা গার্হস্থ্য ধর্মে রমিত না হয়ে নিজ নিজ মাতাপিতা হতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং হিমালয়ে যুগ সম্মতা নাশনী নদীর তীরে উপনীত হয়ে ঋষি

বেশ ধারণ করেন। তথায় দৈব প্রভাবে নিমিত্ত পৰ্ণকুটীরে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন। জীবনের উদ্দেশ্য যে মৈত্ৰী-সাধনাদি শ্রামণ্য ধর্ম পালন করবেন এবং তাতেই নিরত থেকে মৈত্ৰীর পরিপূর্ণতা সাধন করবেন।

এরূপে মৈত্ৰী সাধনায় বহুদিন অতীত হলে দুকূল ও পারিকার মধ্যে অন্ধ হওয়ার হেতু লক্ষ্য করে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদেরকে লোক ধর্মের অনুশীলনে পরামর্শ দিলেন। যাতে পুত্র লাভে ভবিষ্যতে অন্ধ জীবনের দুরবস্থার লাঘব করতে পারেন। তদনুযায়ী তারা নাভীস্পর্শ লোভ-ধর্মের চর্চা করে এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রের নাম রাখেন সুবর্ণ-শ্যাম। তাপস পিতামাতার প্রাণের দুলাল, জন্মাবধি মৈত্ৰীকরণের দীপ্ত পরিবেশে গড়ে উঠে। এক মুহূর্তের জন্য ও কোনদিন হিংসা বিদ্বেষের বিষময় আভাষ তার অন্তরকে আড়ষ্ট করতে পারেনি। সুবর্ণ-শ্যামের ষোড়শ বর্ষ কালে একদিন তাপস দম্পতি বনের ফলমূল আহরণ পূর্বক আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। এমন সময় বারিপাত আরম্ভ হলে এক বৃক্ষ মূলে বহ্মীকোপরি আশ্রয় নিলেন। বহ্মীকের ভিতর থেকে এক বিষধর সর্পের নাসা বায়ুর তেজ প্রভাবে উভয়ের চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়। তজ্জন্য তারা যথাসময়ে আশ্রমে ফিরতে পারেননি। অতঃপর পুত্র সুবর্ণ-শ্যাম মাতাপিতার গৌণ হচ্ছে দেখে তাঁদের অবেষণে বের হন। অবশেষে সেই বৃক্ষতলায় মাতাপিতার দারুণ দুর্দশা দেখে অবাক হন এবং মর্মস্তুদ ব্যথা নিয়ে একটি যষ্টি ধারণ করে তাদেরকে আশ্রমে নিয়ে আসেন। তদবধি শ্যামই হলেন—এই মহারণ্যে অন্ধ মাতাপিতার জীবন সর্বস্ব। অন্ধগণের একমাত্র যষ্টি। এখন আশ্রমের যাবতীয় কর্ম মাতাপিতার পরিচর্যা তাঁকেই করতে হয়। এদিকে তিনি অন্ধ মাতাপিতার যেমন প্রাণ-প্রতিম আরণ্য মৃগাদি পশু-পক্ষীর তেমনি একান্ত প্রিয় ভাজন এবং চিরসাথী। এমনকি বন্য ভীষণ হিংস্র

প্রাণীগুলোও তাঁর সহচর রূপে বাস করত।

এই সময় মৃগ-মাংস লোভী বারানসীরাজ পিলিযক্ষ মৃগয়ার উদ্দেশ্যে হিমালয় প্রবেশ করেন। মৃগসম্মতা নদীর সেই স্থানে সুবর্ণ-শ্যাম ও তাঁর সহচরবৃন্দ উঠানামা করে জল পান করত। সেই স্থানে মৃগ-পদচিহ্ন দশনে দুষ্টমতি রাজা পিলিযক্ষ রক্ষশাখা দ্বারা কোঠা নির্মাণ পূর্বক শরাসনে বিষদিশ্রুত সার সংযোজনা করে লুক্কায়িত ভাবে অপেক্ষা করছিলেন। এদিকে দিবসের সর্ব কর্ম সমাপনান্তে শ্যাম যখন নিত্যসহচর সহচরগণকে সঙ্গে করে সন্ধ্যায় মৃগসম্মতা নদীতে স্নান করতে ও জল আনতে গেলেন, তখন সুযোগ বুঝে রাজা তাঁকে শরবিদ্ধ করলেন। শরাঘাতে তাঁর সর্বাঙ্গ শোণিতাক্ত ও মুখ হতে রক্ত প্রবাহ নিঃসৃত হয়ে মেদিনীপৃষ্ঠ ভেঙ্গে গেল। যতক্ষণ সুবর্ণ-শ্যামের সংজ্ঞা ছিল, ততক্ষণ নিবিকার চিন্তে রাজার সহিত যেরূপ মধুর ও প্রিয় কথোপকথন করেছিলেন তাতে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত ও অনুতপ্ত হন। রাজা যে মৈত্রী করুণার মূর্ত প্রতীকের বক্ষভেদ করলেন, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন, অন্ধ তাপস মাতাপিতার অদ্বিতীয় অবলম্বন যে এই মৃত্যু কবলিত শ্যাম-কুমার তাঁর বিলাপের মধ্যেই প্রকাশ পেল। আপন জীবন মায়া অপেক্ষা অন্ধ মাতাপিতার দুরবস্থার আশঙ্কায় যে প্রকট তা ক্রন্দনের সুরেই বুঝা গিয়েছে। রাজা অনুশোচনায় ধৈর্য হারা হন এবং অঙ্গীকার সহযোগে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁর অবর্তমানে অন্ধ মাতাপিতার আজীবন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজা নিজেই বহন করবেন। রাজার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে শ্যামকুমার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। রাজা মনে করলেন যে শ্যামকুমার মরে গিয়েছে। তিনি নিজের অনুতাপাগ্নিতে স্নিগ্ধমান হয়ে পড়লেন।

অতঃপর রাজা পিলিযক্ষ-দুকূল পারিকার আশ্রমে উপনীত হয়ে অতি কাতর কণ্ঠে কুমারের মৃত্যু খবর নিবেদন করলেন। তত্ক্ষণে

পিতা দুকূল অসৌম ধৈর্যসহকারে নির্বাক ও নীরব রইলেন। কিন্তু স্বভাবতঃ মাতার গদগদ বিচলিত হল। পিতা তাঁকে সান্ত্বনা বাক্যে নিবৃত্ত করলেন; পুত্র হন্তা রাজা মনে মনে আশঙ্কা বোধ করেছিলেন যে শ্যামের মাতাপিতা কি জানি তাঁকে কি অভিশাপই দিয়ে থাকেন। অথচ ফল তার বিপরীত হল। তাকে কোনরূপ রেষোক্তি করলেন না বরং মৈত্রীপূর্ণ আচরণ, মধুর বাক্য ও সগৌরব সম্বর্ধনায় আপ্যায়িত করলেন। এতে রাজা সান্তিশ্রম বিস্মিত হয়ে মর্মাহত ও কৃতার্থ চিত্তে উভয়ের হস্ত ধারণ করে সুবর্ণশ্যাম যেখানে রক্তাক্ত কলেবরে মুচ্ছিত ও শায়িত ছিলেন সেখানে তাঁদেরকে উপস্থিত করালেন। দুপাশে দুজনে বসে পুত্রকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন।

এমন সময় গন্ধ মাদনবাসিনী পরমা সুন্দরী এক দেব কন্যা হঠাৎ তথায় আবির্ভূত হন। এই দেব কন্যা নাকি অতীত সপ্তম জন্মে এই শ্যামকুমারের জননী ছিলেন। দীর্ঘ সাত জন্ম পরেও পুত্র স্নেহ ত্যাগ করতে পারেননি। পুত্রের মৃত্যু তুম্বা ঘটনা দর্শনে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। দুকূল-পারিকা ও দেবকন্যা এই তিনজন আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন, মৈত্রী সাধনা ও দৈন্যশক্তির প্রভাব দ্বারা সত্যক্রিয়া করলেন। তদুপপ্রভাবে শ্যামকুমার দুই একবার পাশ কেটে নিবিষ হয়ে সজ্জা লাভ করলেন এবং উঠে বসলেন। তন্মুহূর্তে অন্ধ দুকূল পারিকাও দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। তখন সেখানে আনন্দের রোল পড়ে গেল। রাজার চক্ষে এসব অদ্ভুত ঘটনা প্রায় স্বপ্নবৎ মনে হচ্ছিল। রাজা তো নির্বাক। এবার শ্যামকুমার অহিংসা সম্পর্কীয় বহু উপদেশ দানে রাজাকে ধর্মগথে আনলেন।

অতঃপর সারাজীবন মাতাপিতার সেবা, মৈত্রী, করুণাদি সাধনায় কৃতকৃতার্থ হয়ে শ্যামকুমার মরণান্তে ব্রহ্মলোক পরায়ণ হলেন।

মৈত্রী সাধনার পর্য্যায় অনুসারে প্রথমতঃ তুলনার নিমিত্ত নিজের প্রতি মৈত্রী সম্প্রসারণ করে তদন্তর সাধনার সৌকার্যার্থ সাধক তার একান্ত প্রিয় শ্রদ্ধেয় আচার্য, উপাধ্যায়, মাতাপিতা ও উপকারী ব্যক্তির প্রতি পোষণ করবেন। নিজের পরেই তাদের স্থান। যারা সত্য পথের প্রদর্শক, যাদের মহান প্রেরণা মূলক শিক্ষা কর্তব্য-অকর্তব্যে অনুশাসন পরলোক যাত্রার পাথেয়, অপরিসীম জ্ঞানদাতা সকল অক্লান্ত দূর অন্তর জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত করেন, যাদের রক্তমাংসে দেহ গঠিত, অপত্য-স্নেহে জীবন লালিত পালিত, যাদের ঋণ জাগতিক কোন পদার্থের বিনিময়ে পরিশোধ্য নহে, এ হেন মহোপকারী আচার্য উপাধ্যায় ও মাতাপিতা, তাঁদের প্রতি পরপর মৈত্রী পোষণ বিধেয়।

মাতাপিতাকে পূর্বাচার্য বা আদ্য-গুরু রূপে বর্ণনা এবং ব্রজ্জার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কিরূপ গুণ গরিমায় মাতাপিতা সন্তানের নিকট ব্রজ্জসদৃশ ও পূর্বাচার্য তা একটু আলোচনার প্রয়োজন। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে :

ব্রজ্জাতি মাতাপিতরো পূর্বাচারিয়াতি বৃচ্চরে,

আহনেয্যা চ পুস্তানং পহায় অনুকম্পকা।

পুত্রের নিকট মাতাপিতা সর্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রজ্জতুল্য। মাতাপিতা আদ্য-গুরু এবং সর্বদা পূজনীয়।

“জগতের প্রাণীগণের প্রতি ব্রজ্জার চার প্রকার ভাবনা—
“জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুক।
সকল প্রাণী নিজ নিজ সম্পত্তি পরিভোগে বঞ্চিত না হোক। জগতের
সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মাধীন”। মাতাপিতার অন্তরেও ব্রজ্জার মত
পুত্রের প্রতি এই চার প্রকার ভাবনা অহরহ বিদ্যমান। পুত্রের

জন্মের বহু পূর্ব থেকেই মাতাপিতার অন্তরে সৎ পুত্র লাভের যে শুভাকাঙ্ক্ষা পোষিত হতে থাকে,— তাই মৈত্রী। বহুদিন ব্যাপী সাধনার বশ্ত পুত্র মুখ দর্শনের পর মাতাপিতা দেহ মনের সর্বস্ব ত্যাগ করে সকল দৈন্য উপেক্ষা করে, স্নেহ ভরা বৃকে বৃকে, মমতাপূর্ণ চোখে চোখে, মায়ামুগ্ধ প্রাণের ঘেরায় সন্তানকে প্রতিপালন করেন, প্রাণ সম ভানে তিলে তিলে সন্তানের জীবন গঠন করেন। জীবনের ক্রমঃ বিকাশের, উন্নতির ধাপে ধাপ মাতাপিতার অন্তর অগাধ। সন্তানের সেবা-যত্নে অকুষ্ঠ আত্মোৎসর্গ, ক্লান্তিহীন আত্মদান। তাতেই তাদের পরমানন্দ, তাদের পরম গৌরব। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার এই যে ত্যাগ তিতিক্ষা, একাত্মতা তা সবই মৈত্রীর অকুণ্ঠিত প্রেরণার নিদর্শন। সন্তানের দুঃখে বিপদে মাতাপিতার অন্তরে যে কাতরতা তা করুণার লক্ষণ। সন্তানের অলাভে, অযশে, অসুখে, অশান্তিতে, উন্নতির ব্যাঘাতে তাদের অন্তর স্নিগ্ধমান হয়—তাও করুণা। দুঃখ বিপত্তি থেকে মুক্তি কামনা করুণার কৃত্য। সন্তানের সুখস্বাস্থ্যদ্যে মাতাপিতার আনন্দের অন্ত থাকেনা। সন্তানদ্বারা লব্ধ সম্পত্তি বিনষ্ট না হোক, সম্পত্তি পরিভোগে বঞ্চিত না হোক, দ্রাতি-ভগ্নী, পুত্র-কলত্র সমন্বিত সন্তান পরিবার সুখে সমৃদ্ধিতে জীবিকা নির্বাহ করুক, এই সব আকাঙ্ক্ষা, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার অন্তরে মুদিতার কার্য। সন্তান যখন সাংসারিক সকল প্রকার দায়িত্বভার বহনে সক্ষম হয়, মাতাপিতারও যখন ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমন করার সময় উপস্থিত হয় তখন মাতাপিতার অন্তরে এরূপ ভাবের সঞ্চার হয়—আমাদের যা কিছু কর্তব্য ছিল সব সমাপ্ত। আমাদের আর করার কি আছে? এখন তাদের কর্ম, কর্মকুশলতা ভাল হলে তাদের মঙ্গল, কর্মকুশলতা-খারাপ হলে তাদের অমঙ্গল। আমরা কি করব? এরূপ ভাবের নাম-উপেক্ষা।

আজীবন পোষিত মৈত্রী-করুণা মুদিতা-উপেক্ষা সন্তান-সন্ততির

প্রতি মাতাপিতার অন্তরে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। তদ্ব্যতীত শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে যে মাতাপিতা সন্তানের নিকট সাক্ষাৎ দেবতা, স্বয়ং ব্রহ্ম। শিশুদের প্রতি যা করা হয় অলঙ্ঘ্য তাদেরকে তা শিক্ষা দেওয়াও হয়। স্নেহ করলে স্নেহ করতে শিখে, হিংসা করলে হিংসা করতে শিখে, শুভ হোক, অশুভ হোক, আচারে ব্যবহারে, দর্শনে, শ্রবণে যখন যা আসে তাই শিশুরা শিখে। তাই উক্ত হয়েছে—মাতাপিতাই সেই শিক্ষার আদি উৎস, আদ্যগুরু রূপে বণিত। মাতাপিতার সাহচর্যই সন্তানের জীবনে সর্বপ্রথম। তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষাই সন্তানের জীবনে আজীবন প্রাধান্য লাভ করে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—The hand that rocks the cradle rules the world. —Napoleon.

মায়ের হে হাত শিশুর দোলনা দোলায়, সেই হাত বিশ্ব শাসন করে। শাস্ত্রে মাতাপিতার গুণ-মাহাত্ম্য এরূপ মধুর প্রাঞ্জল ভাষায় কীৰ্ত্তিত হয়েছে।

‘পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম পিতা হি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্যে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা ॥

পিতুরপাধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণাৎ।

ততো হি প্রিযু লোকেষু নাস্তি মাতু-সমো গুরু ॥’

পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতা পরম তপস্যা, পিতাকে প্রীত রাখতে সমর্থ হলে তাকে সকল দেবতা রক্ষা করে। গর্ভ ধারণ ও পোষণ—এই দুই অবদান প্রভাবে পিতা অপেক্ষা মাতার গুণ-মহিমা সমধিক। এজন্য মাতার সমতুল্য গুরু হিসাবে আর দ্বিতীয় নেই। মায়ের গুণ বর্ণনায় শাস্ত্রে আরো উল্লেখ আছে যে, জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী। ইসলামিক হাদিসে আছে—‘আলজাম্মাতু তাহাতে আকদা মে উশ্মতা।’ বেহেশ্ত হচ্ছে মায়ের পদতলে। সারা জীবনের সেই কমধারার প্রভাবে জীবনাবসানে মানুষের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে—মায়ের পায়ের তলা থেকে

যে জীবন প্রবাহ সূনিয়ন্ত্রিত সুসংযত ভাবে প্রবাহিত হয় তার সংগতি অবশ্যজ্ঞাবী। তার উৎস হচ্ছে—মায়ের পায়ের তলা। মাতাপিতার গুণ-অপরিসীম। তাঁদের গুণ কীর্তন সন্তানের জীবনের অপরিসীম কর্তব্য। মাতৃ-পিতৃ ভক্তির সাধনা জীবনে যে যত বেশী করতে শিখে, সেই তত জীবনোন্নতি করতে সক্ষম। তাঁদের গুণানুশীলন সন্তানের জীবনে মহার্ঘ্য পূজা। বাংলার বৌদ্ধ সমাজের প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও বিশিষ্ট সমাজ কর্মী স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র মৃৎসুদী মাতা পিতার গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে ‘মাতৃপূজায় মানব ধর্ম’ নামে এক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর গ্রন্থটি সকল শ্রেণীর লোকেরই পাঠ্য। ধর্মপদ গ্রন্থে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন—

সুখা মত্তোযাতা লোকে অথো পেত্তোযাতা সুখা,

সুখা মামঞ্ঞ তা লোকে অথ ব্রহ্মঞ্ঞ তা সুখা।

এ জগতে মাতৃভক্তি সুখকর, পিতৃভক্তিও সুখকর, তেমনি শ্রমণ সংস্কার এবং ব্রাহ্মণ পরিচর্যা সুখদায়ক। শ্রমণ ব্রাহ্মণের সেবা-যত্ন মনুষ্য জীবনে মহান শান্তিকর বলে উল্লেখ থাকলেও মাতৃ-পিতৃ ভক্তির চর্চা সর্বাগ্রে বিহিত বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। মহা অগ্নি-স্কন্দ সূত্রে বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি মাকে এক কাঁধে, পিতাকে অপর কাঁধে তুলে রাখে এবং আজীবন পরমা ভক্তির সাথে সেবা-যত্ন পূজা করে তথাপি তাঁদের ঋণ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে না। তাঁদের ঋণ জাগতিক সম্পদে, ব্যবহারে কিংবা সেবা সংস্কারে অপরিশোধ্য। মাতাপিতা অগ্নিতুল্য। অগ্নি মানুষের জীবনে অপরিসীম বস্তু। অগ্নি ছাড়া মানুষের এক মুহূর্তও চলে না। জলের অপর নাম যেমন জীবন, অগ্নির অপর নামও তেমনি জীবন হতে পারে। এহেন মহোপকারী অগ্নির সঠিক ব্যবহারে জীবের জীবনী শক্তি স্থিত থাকে, রক্ষিত হয়, কিন্তু ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটলে, ভুল প্রমাদে জীবন সম্পদ জলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তদ্রূপ মাতাপিতার

প্রতি সন্তানের যে কর্তব্য, তা সঠিকভাবে পালিত হলে পরম সৌভাগ্যের উদয় হয় আর সেই কর্তব্যের ক্রটি হলে সন্তানের জীবজন্মে পুড়ে চরম দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি হয়।

এ হেন মহান গুণ-মাহাত্ম্য সম্পন্ন দেব-ব্রহ্মাত্মলা মাতাপিতার প্রতি ভীষণ অত্যাচার করতে আমরা জীবনে কয়েকজন নরাধমকে প্রত্যক্ষ করলাম। এরূপ একটা লোমহর্ষকর অমানুষিক ঘটনার উল্লেখ করলে সম্ভবতঃ অগ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমাদের গ্রামবাসী দু'এক জন লোক প্রায়ই মাতাপিতার প্রতি দৈহিক অত্যাচার উৎপীড়ন করত, মারধর করত। এতে গ্রামের লোকেরা মাতাপিতার উপর নির্যাতন বরদাস্ত না করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেও বারণ করতে পারেনি। একদিন এক নরাধম কোন এক অজ্ঞাত কারণে মায়ের উপর প্রচণ্ড ক্রোধাক্ত হয়ে মেরে পিটে হাত-পা বেধে প্রখর রোদ্রে চিৎকারে শুইয়ে রাখল। তাতেও সেই নর-পশুর নারকীয় ক্রোধের তৃপ্তি মিটল না। অবশেষে আমগাছ থেকে লাল পিঁপড়ার বাসা এনে অভাগিনী জননীর সর্বাঙ্গে ভেঙ্গে দিল। এই পাশবিক অত্যাচারের অসহ্য যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে মা কুলঙ্গার পুত্রকে এই বলে অভিশাপ প্রদান করল :—
“অহো! আমার উপর তোর এই অত্যাচার,—তুই হঠাৎ গাছ থেকে পড়ে মর, তোকে শকুনে খাক”।

কিছুদিন পর মা চলে গেল পরলোকে। আর সেই নর পশু একদিন গ্রামান্তরে এক আত্মীয়ের বাড়ী গেল। তখন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাস। টকটকে পাকা আম গাছে ঝুলন্ত। তড়িৎ বেগে গিয়েই সে আম গাছের আগায় আরোহণ করল আম আহরণে। হঠাৎ ডাল ভেঙ্গে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং বিকট চিৎকার দিতে দিতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হল। দুর্গত পাপাত্মার মৃত্যু স্ববরে

আমাদের গ্রামবাসী লোকজন ছুটে গিয়ে দেখল পাপাত্মার এই দারুণ অপমৃত্যু। তারপর সকলে মিলে পরামর্শ করল যে তার মৃতদেহ স্বগ্রামে নিয়ে আসবে। এরূপ সিদ্ধান্তে স্বগ্রামবাসী ও আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহ নিয়ে যখন স্বগ্রামাভিমুখে রওনা হল, তখন আকাশ থেকে শত শত শকুন আচম্বিতে এসে পাপিষ্ঠের মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। স্বগ্রামে পৌঁছবার পূর্ব পর্যন্ত শকুনির দল বারবার আক্রমণ করে, কিন্তু শব-যাত্রীদের সতকিত তৎপরতায় সফলকাম হতে পারল না। মাংসের অভিশাপের শেষাংশ তারা কার্যকরী হতে দিল না।

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি পাপকারী উভয়র্থ তপ্পতি।

পাপং মে কতন্তি তপ্পতি ভিযো তপ্পতি দুগ্গতি গতোতি।

ধর্মপদ।

পাপাত্মা ইহলোক, পরলোক, উভয়লোকেই অনুতাপ ভোগ করে। অহো আমি পাপ করেছি বলে দুগতি গমনে অধিকতর অনুতপ্ত হয়। এরূপ বীভৎস ঘটনার নায়ক যে পাপাত্মা, তার অনুশোচনা তো স্বাভাবিক। মৃত্যুর পর তার গতি যে কোথায় কিরূপ হবে তা অতি সহজেই অনুমেয়। তথাগত বুদ্ধের দ্বিতীয় অপ্রশ্রাবক মোগ্গল্লায়ণ মহাজ্ঞানী মহাঋদ্ধিমান হয়েও পূর্ব জন্মাজিত মাতৃ-নির্যাতন কর্ম প্রভাবে অন্তিম জীবনে দৈহিক নির্যাতন ও অপমৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাননি বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

মাতাপিতার ঋণ অপরিশোধ্য নাই।

পাখিব সম্পদের বিনিময়ে বা ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্য সম্পাদনে মাতাপিতার ঋণ অপরিশোধ্য বলে শাস্ত্রে উল্লেখ থাকলেও অপাখিব পারলৌকিক কর্তব্য সাধনায় মাতাপিতার ঋণ অপরিশোধ্য নহে। তা কিরূপে সম্ভব? অশ্রদ্ধাবান, শ্রদ্ধাবান, সুশীল, ধার্মিক

করে তোলা যায়, তবে মাতাপিতার ঋণ পরিশোধ করা হয়। পর লোকগত মাতাপিতার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি পারত্রিক কর্মের দ্বারা যে উপকার সাধন করা হয় তাও ঋণ পরিশোধ হেতু। এজন্য মাতাপিতা প্রভৃতি পূর্ব পুরুষগণ ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমন করলে পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি পরবর্তী বংশধরগণ তাঁদের উদ্দেশ্যে সংঘদান, পিতৃদান, তিথি—পার্বণ শ্রাদ্ধাদি নানাবিধ পারত্রিক অনুষ্ঠান দ্বারা গুণানুশীল ও স্মৃতিপূজা করে থাকে। এর নাম ধর্ম দান। তথাগত বুদ্ধ বলেন :

সক্সদানং ধম্মদানং জিনাতি।

ধম্মপদ

ধর্মদান সকল দানকে জয় করে। ধর্মদান পাখিব সকল উপকারক দানকে পরিশোধ করে মাতাপিতাকেও ঋণী করতে সক্ষম। ব্রহ্মবিহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। পণ্ড-প্রিয়তা, সন্তান-বাৎসল্য, 'দেশ-নুরাগ, বিশ্বপ্রেম-সবই ব্রহ্ম-বিহার। সন্তানের জীবনে মাতাপিতার প্রতি যে ভক্তির চর্চা, গুণকীর্তন, স্মৃতিপূজা-তাও ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মবিহার সাধনার মূল উৎস বা সর্বপ্রথম প্রাপ্তি মাতাপিতার অন্তর থেকে। এই শিক্ষা অতিপবিত্র। নিঃস্বার্থ ও অনাসক্ত। ইহাই প্রথম শিক্ষা। সে জন্য মাতাপিতাকে আদ্যগুরু রূপে বর্ণিত। মাতাপিতাকে আদ্য-গুরু রূপে বর্ণিত হলেও ব্রহ্মবিহার সাধনায় কিন্তু আচার্য-উপধ্যায়কে অগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে। যেহেতু মাতাপিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক মুখ্যতঃ দৈহিক; মৈত্রী-করুণা প্রধান; কিন্তু আচার্য উপধ্যায়ের সাথে শিষ্যের সম্পর্ক অপাখিব আত্মিক এবং জ্ঞান প্রধান।

মৈত্রী সাধনার অগ্নি পরীক্ষা

এরূপে নিজ জীবন আচার্য উপাধ্যায় মাতাপিতা ও অতিশয় প্রিয় হিতৈষীর প্রতি মৈত্রী ভাবনা করতে করতে চিত্ত যখন কর্মক্ষম হয়, তখন মধ্যস্থের প্রতি মনোনিবেশ করতে হয়, যারা প্রিয়ও নহেন,

অপ্রিয়ও নহেন—এরূপ মধ্যস্থের প্রতি সরল মৃদু ও কর্মক্ষম করে ভাবনার পরবর্তী বিষয় মনঃসংযোগ করা উচিত। পরবর্তী বিষয় ব্যক্তি হচ্ছে—বৈরী বা শত্রু। অন্যান্য ব্যক্তিগণের প্রতি মৈত্রী পোষণে ব্যাঘাত নেই; কিন্তু শত্রুর প্রতি মৈত্রী পোষণ অতীব কঠিন। এখানেই ভাবনাকারীর অগ্নিপরীক্ষা। মধ্যস্থের পরই শত্রুর প্রতি মৈত্রী সম্প্রসারণের বিধান। যে আমার নিতা ক্ষয়-ক্ষতি করে, জীবন-নাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সাধারণতঃ সেই শত্রু নামে অভিহিত। শত্রুর প্রতি কিরূপে মৈত্রী পোষণ করি যে, “সে সুখী হোক, দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করুক।” যদি শত্রুর প্রতি মৈত্রী প্রয়োগ করতে গিয়ে শত্রুর পূর্বকৃত অপরাধ স্মরণ হেতু ক্রোধ বা বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়—তবে মৈত্রী সাধকের সাধনা অচ্যুত ঘটবার সম্ভাবনা। তখন অবশ্যই পূর্বোক্ত যে কোন কারো প্রতি পুনঃ পুনঃ মৈত্রী ভাব প্রয়োগ করে চিন্তকে ক্রোধ উপক্লেষ মুক্ত করে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করতে হবে। এতেও যদি চিন্ত উপশান্ত না হয়, তবে করুণাঘন তথাগতের উপদেশ মাহাত্ম্য স্মরণ করতে হবে।

ককচুপস ওবাদ আদীনঃ অনুসসরতো,

পটিঘস্‌স পহানায় ঘটিতবং পুনপ্পনং।

বিজ্ঞানমাগ্গ

তথাগত বুদ্ধ বলেছেন,—‘হে ভিক্ষুগণ, যদি উত্তর দিকে দন্ত-যুক্ত ধারাল করাত দ্বারা চোর ডাকাতেরা অগ্ন প্রত্যঙ্গ ছেদন করে ফেলে, তথাপি যার অন্তরে সামান্য বিদ্বেষ ভাব জন্মায়, সে আমার শাসনের অধিকারী নহে, আমার উপদেশের প্রকৃত অনুসারী নহে, সে অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ হতে বিচ্যুতি হয়েছে বলা যায়।’ যে ব্যক্তির ক্রুদ্ধের প্রতি ক্রোধ করে, সে তাতে অধিকতর পরাজিত হয় আর ক্রুদ্ধের প্রতি ক্রোধ কিংবা বিদ্বেষ পোষণ না করে যে

ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করেন। তিনি আত্মপর উভয়েরই হিত সাধন করেন। শত্রু যদি আপন হৃদয় কলুষিত করে আমাকে আক্রোশ করে, তবে আমিও কি আমার অন্তঃকরণ বিক্ষুব্ধ করে শত্রুর প্রতি আক্রোশ করব? যদি তাই হয়, তবে আমি নিজেই নিজের নৈতিক অধঃপতন ডেকে আনব। শত্রু ক্রোধাক্ত হয়ে অহিত মার্গ অনুসরণ করবে বলে আমি কেন তা করতে যাব? বহু উপকারী মাতাপিতা-আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে দুর্লভ মানব জীবন লাভ করেছি এখন কেন মহাশত্রু তুল্য বিদ্বেষ পোষণ ত্যাগ করতে পারব না।

করুণাঘন তথাগতের ধর্মের মূলনীতি হচ্ছে,—শীল, সমাধি, প্রভা। এগুলোর মূলোচ্ছেদকারী হচ্ছে এই ক্রোধ বিদ্বেষ, ক্রোধ-বিদ্বেষ যুক্ত কর্ম অনার্থ জীবন। কাপুরুষাচিত ব্যবহারের উপর আমরা দৃঢ় পোষণ করি—এখন কেন আবার এগুলোর মনোরম পূর্ণ করতে যাব। বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে অপরকে কলুষিত অপবিত্র করার চেষ্টা করলে অনেক ক্ষেত্রে তা সফল হয় না। তাতে নিশ্চয়তা থাকে না। কিন্তু নিক্ষেপকারীর প্রথমেই কলুষিত হওয়া সুনিশ্চিত। আমরা অপরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করে অপরের অনিষ্ট সাধন করতে সক্ষম হই আর না-ই হই—কিন্তু আমরা প্রথমেই নিজেকে ধ্বংস করি, ক্রোধান্বিতে অনুতপ্ত হই, বোধিসত্ত্বের মৈত্রী পারমিতার সাধনা ও মৈত্রী সাধকের আদর্শ অনুসরণ যোগা,—

এবমাক্ষাশ নিষ্ঠাস্তস সত্ত্ব ধাতোর নেকথা।

ভবেষ মুপ জীবো হং যাবৎ সর্বং ন নির্বৃতাঃ ॥

সুগ্ধ সমুচ্চয়।

অনন্ত আকাশে যত জীব লোক আছে, সেই জীবলোক সমূহে যত জীব আছে, যত দিন পর্যন্ত সেই সমস্ত জীব নির্বাণ লাভ না করে ততদিন পর্যন্ত এভাবে নানারূপে আমি তাদের উপজীব্য হব। একটি প্রাণীর জন্মও সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত এ জগতে অব্যাহত

করব। স্মরণ করা উচিত যে সুবর্ণ-শ্যাম জন্মে বোধিসত্ত্ব বারানসী রাজ পলিমক্ক কত্ত্বক বিষাক্ত শর বিদ্ধ হয়েও রাজ্যের প্রতি ক্রুরপে মৈত্র পোষণ করেছিলেন ও তার পরিনতি কি হয়েছিল? স্মরণ করা উচিত যে এক রাজ জন্মে নিরপরাধ ধার্মিক বোধিসত্ত্বকে যখন কোশলরাজ দ্রব্যাসেন বন্দী করে রাজ্যাধিকার পূর্বক শিকায় তুলে অধঃশির করতঃ দরজার ঝপকাবে ঝুলিয়ে রাখেন, দ্রব্যাসেনের প্রতি মৈত্রী পোষণ করতে করতে তার সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। আপনি আপনি বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দর্শনে দ্রব্যাসেন বোধিসত্ত্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর রাজ্য তাঁকে ফেরৎ দিলেন।

এরূপে বোধিসত্ত্বের জীবনাদর্শ স্মরণ করেও যদি উদ্দেশ্যানুসারে ফল পাওয়া না যায় তবে নিজের কোন প্রিয় মনোজ বস্তু অতীব বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে শত্রুর প্রতি ত্যাগ করবেন দানের গুণ অসীম। দানের মাহাত্ম্য এত ব্যাপক যে তদ্বারা শত্রুকে নিশ্চিত রূপে মিহ্ন করা যায়।

দানং তানং মনুস্সানং দানং দুগ্গতি বারণং,
 দানং সগ্গস্স সোপানং দানং শান্তিকরং পরং ।
 অদন্ত দমনং দানং দানং সস্বথ সাধকং,
 দানেন পিয়বাচায উন্নমন্তি নমন্তি চাতি ।

বিশুদ্ধিমাগ্গ ।

দান মানুষের হ্রাণের উপায়, দান দুর্গতি বারণ করে, দান স্বর্গের সোপান, দান পরমাশান্তির হেতু। দান অবান্তকে দমন করে, দান সর্বার্থ সাধন করে। দান ও প্রিয় বাক্য দ্বারা মানুষের হৃদয় উন্নত ও উদার হয়। শত্রুকে জয় করার শ্রেষ্ঠ পন্থা—দান। দান করার পূর্বে দান প্রণীতা রূপ শত্রুর প্রতি যে শুভঙ্খা পোষণ করা হয়, এতেই শত্রু-ভাব অধেক দমিত হয়ে যায়।

এরূপে বৈরীর প্রতি বৈরীভাব পরিহার পূর্বক প্রিয় ব্যক্তির ন্যায় বৈরীর প্রতি মৈত্রী পোষণ করতে হয়। এতেও যদি সূফল পাওয়া না যায়, তবে পক্ষক্ষত বা ধাতু বিন্যাস সম্পর্কিত চিন্তার প্রয়োজন। সচেতন ও অচেতন পদার্থে পূর্ণ এই জগৎ। পদার্থ সমূহের স্বাভাবিক বিধানানুযায়ী প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন পরিবর্তনশীল। যে শত্রু পূর্বে আমার কোনরূপ ক্ষয় ক্ষতি করেছে, জগতের অনিত্যতা হেতু, ক্ষণিক পরিবর্তনশীলতা হেতু যে এখন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। সে এখন বর্তমান নেই, এখন যাকে আমি শত্রু মনে করি, সে আর আমার অনিষ্টকারী শত্রু—এক নহে। কাজেই আমি কার উপর আক্রোশ করছি। আমার এই আক্রোশ অযৌক্তিক।

এরূপভাবে প্রিয় মধ্যস্থ, অপ্রিয় কিংবা নিজের মধ্যে তারতম্য। ভেদবুদ্ধি ঘুচে যখন সকলের প্রতি সমান ভাব আসে, তখন মন করতে হবে যে সাধকের মৈত্রীভাব সসীম হতে অসীমের পথে অগ্রসর হচ্ছে। আর যদি সামান্য ভাব না আসে, বুঝতে হবে মৈত্রী ভাবনায় চিত্ত এখনো অপটু।

এবার সাধক বোধিসত্ত্বের ক্ষান্তি ও উপেক্ষা পারমিতার প্রতি মনোনিবেশ পূর্বক এঙলোর মাহাত্ম্য স্মরণ করতঃ শত্রুর প্রতি শত্রুভাব দমন করবেন। স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে শত্রু মিত্র দুই বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তি শত্রুকে কি করে মিত্র তুল্য এক ও অভিন্নরূপে ভাবতে পারি? যে আমার প্রাণ বধ করার ষড়যন্ত্রে নিত্য লিপ্ত রয়েছে, সে তো আমার পরম শত্রু। আমি তাকে কি করে ক্ষমা করব কিংবা যুক্তির সঙ্গে ভালবাসতে পারি যে কারণে উদ্দাম ওদ্ধতোর বজ্র হস্তে জগতের প্রাণী একে অন্যকে সংহারে উদাত। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসহ্য, অধৈর্য্য একে অন্যকে মুছে ফেলে, সেই কারণ সকলের মধ্যে সমান। নিজে বাঁচার উদ্দেশ্যে, আপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আহরণে ও পদলোভে একে অন্যকে ধ্বংস করতে নিরন্ত

হয়। ফলে সকলেই সমতুল্য ধ্বংসস্তূপে পরিণতি লাভ করে।
 এক্ষেত্রে একটি গল্প প্রনিধান মোগা : তিনজন সুঠাম যুবক একদিন
 মদ্যপান করে ভীষণ উত্তমত্ত হয়ে পেল। তারা পরস্পর কুস্তাকুস্তি,
 ধস্তাধস্তি আরম্ভ করল আর বলতে লাগল,—“মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে
 শেষ করে ফেলব। মৃত্যু তামাম দুনিয়াকে ধ্বংস করে ফেলল।
 মৃত্যু সর্বগ্রাসী, মৃত্যুর কবলে পড়ে জগতের প্রাণী যতদুঃখ অশান্তি
 ভোগ করছে, তাকে যেখানে পাই তাকে ধ্বংস করা চাই। তাকে
 উচ্ছিন্ন করতে না পারলে জগতে শান্তি আসবে না।” এমন সময়
 রাস্তা দিয়ে এক জরা-জীর্ণ অস্থিসার রুদ্ধ যাচ্ছিল। রুদ্ধ জাগতিক
 দুঃখে অস্থির হয়ে মুহমুহঃ মৃত্যু কামনায় ‘মৃত্যু, মৃত্যু’ বলে চীৎকার
 করতে ছিল। তচ্ছবনে মদ-মত্ত যুবকেরা মনে করল—এই তো মৃত্যু।
 আমরা যাকে চাই—সে তো এই। এই বলে মাতালগণ রুদ্ধকে
 পাকড়াও করল এবং বলল—এক্ষণই তাকে শেষ করে ফেলব। রুদ্ধ
 মৃতপ্রায় হয়ে বলল—ভাই, আমি মৃত্যু নই, তোমাদের ন্যায় আমিও
 একজন মানুষ। তোমরা যেমন মৃত্যুকে খুঁজছ, আমিও মৃত্যুকে খুঁজে
 বেড়াচ্ছি। রুদ্ধ অবস্থা বুঝে তাদেরকে বলল—দেখ ভাই এই যে
 পাহাড় দেখছ—তারই ও ধারে মৃত্যু বাস করে। তোমরা যদি
 মৃত্যুকে পেতে চাও, পাহাড়ের ওধারে চলে যাও। রুদ্ধের মুখে
 মৃত্যুর খবর পেয়ে তারা লাফালাফি করতে করতে পাহাড়ের ধারে
 গিয়ে দেখল—তিনটি বস্তা পাশাপাশি পড়ে আছে। প্রত্যেকটি বস্তা
 সোনার কাঠিতে পূর্ণ। তদ্বর্ণনে মাতালেবা বলতে লাগল “আর
 কি চাই, সারা জিন্দেগির যার জন্য যুদ্ধ করছি তা তো একেবারেই
 আজ সব পেয়ে গেলাম। যা ভাই, বাজারে যা, একটা কাঠি বিক্রয়
 করে একসেরী তিনটি বোতল আর সের পাঁচেক মাংস নিয়ে আয়।”
 এই সিদ্ধান্তে মদ মাংস আহরণে একজন চলে গেল বাজারে।
 অপর দুইজন রইল বস্তা পাহারায়। বস্তা পাহারায় নিযুক্ত দুইজন

যুক্তি করল—চলবে ভাই, এক কাজ করি, বাজার থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে ফেলি। মদ-মাংস যা বাজার থেকে আনবে—তার সবটাই আমরা দুজনে ভাগ করে নিতে পারব। এই যুক্তিতে উভয়েই একমত হল। এদিকে যে বাজারে গিয়েছে সেও একটা বুদ্ধি খাটল পাহারাদার দুজনকে যদি কোন উপায়ে শেষ করা যায়, তবে আমি একাই সমস্ত সম্পদের মালিক হব। এই উদ্দেশ্যে দুটো বোতল মদের সহিত বেশ কিছু পরিমাণ বিষ মিশ্রিত করল, অপর বোতলটি সাবধানে রক্ষা করল। কিছুক্ষণ পর যখন মদ-মাংস নিয়ে বাজার থেকে আসল—অমনি তাকে দুজনে ধরে মারপিট করতে করতে যমপুরীতে পাঠিয়ে দিল। অতঃপর মহোৎসবে মদ্যপানে ও মাংস ভক্ষণে পরম তৃপ্তি লাভ করল। কিন্তু হায়! কিছুক্ষণ পর যখন বিসক্রিয়া আরম্ভ হল তখন বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে যায় বলে ধরফড় করতে করতে চিরতরে ধরায় শাস্তি হয়ে পড়ল। এরূপে একে অন্যের প্রতি দুরভিসন্ধি এঁটে প্রত্যেকেই মৃত্যুর কবলে কবলিত হয়ে গেল। কবিগুরু যথার্থই বলেছেন :—

আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়িয়ে অভিমান

মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিত্তান্তঃসম সবার সমান।

পূর্বোক্ত গল্পের তাৎপর্য বিশ্বজোড়া। বিশ্বের সর্বত্র তার একটা ঘনীভূত অচঞ্চল ছায়া পড়ে আছে।

বুদ্ধের নীতি ধর্ম শত্রু বলতে কেউ নেই, জগৎ মিত্রে পরিপূর্ণ

মৃত্তিকাময় পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল ও জলের ন্যায় উপেক্ষা পরায়ণ বোধিসত্ত্বের জীবনাদর্শে আমরা উপযুক্ত শক্তির দৈন্যে ক্ষমাশূন্য হয়ে পড়েছি। ক্ষমা ও উপেক্ষার মাধুর্য আমাদের চিত্ত-গর্ভে শূন্যতা

লাভ করেছে। কাম-ক্রোধাদির এরূপ অত্যাশ্রয়ী লীলা সংসার ক্ষেত্রে
 বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। ইহা খুবই স্বাভাবিক। এ জগতে মানুষ কাম-
 ক্রোধাদির তাড়নায় ছুরিকা দ্বারা নিজেকে নিজেকে আঘাত করে, আহার
 ত্যাগ করে, উপবাস করে, কেহ ফাঁসির কাণ্ডে ঝুঁলে, কেহ উচ্চ
 স্থান থেকে নিজেকে নিম্ন প্রপাতে নিক্ষেপ করে, গাড়ীর নীচে চাপা
 খেয়ে মরে, অকূল পাথারে ঝাঁপ দেয়, কেহ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা
 করে। কাম ক্রোধাদির অধীনতা হেতু হতভাগ্য জীব যদি জগতের
 সর্বাধিক প্রিয় আপনাকে এভাবে আঘাত হানতে পারে, তবে স্বার্থের
 অন্ধতায় অপরকে আঘাত করা তো সচরাচর ও স্বাভাবিক ঘটনা।
 লোভ-দ্বেষ্টের তাড়নায় মানুষ কিনা করতে পারে?

সাধারণতঃ যাকে বলা হয়েছে—দুঃখ বা শঙ্কু তাকেও বৌদ্ধ
 ধর্মের উচ্চাঙ্গের নৈতিকবোধে ও যুক্তির প্রভাব বলা হয়েছে—পরম
 মিত্র। এজন্য তথাগত বুদ্ধের নীতি ধর্মে দুঃখ বা শঙ্কু বলতে কেউ
 নেই। জগৎ মিত্রে পরিপূর্ণ। যে আমার জীবনের সর্বত্র ধ্বংস
 করার কাজে লিপ্ত—তাকেও বলা হয়েছে পরম বন্ধু। কারণ, ক্রমা
 ও উপেক্ষা নামক মানবের যে শ্রেষ্ঠ গুণ থাকে, সে গুণের অধিকারী
 না হলে মানবতা অসম্পন্ন থেকে যায়, মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব ক্ষুণ্ণ
 হয়। জগতের সকল ক্ষেত্রেই শান্তি লাভ কঠিন হয়ে পড়ে।

মানুষ যদি আদর্শ জীবন, আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র গঠন
 করতে চায়, মানুষ যদি নির্বিবাদে সুখ-শান্তির সহিত এ পৃথিবীতে
 বাস করতে চায়, ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, জাতিগত স্বার্থপরতা ও ভেদ-
 বৈষম্য বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর সকল মানুষ যদি এক ও অভিন্ন
 মহামিলন তীর্থে মিলিত হতে চায়, মানুষ যদি সংসার দুঃখ থেকে
 মুক্তিলাভের অভিপ্রায়ে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন পূর্বক পূর্ণ
 মানবতা অর্জন করতে চায়, তবে ক্রমা ও উপেক্ষা ধর্মের অনুশীলন
 ছাড়া গত্যন্তর নেই। ক্রমা ও উপেক্ষা ধর্মের সাধনা হয়—অন্যায়,

অত্যাচার, অবিচার ও শত্রুতাকে অবলম্বন করে। ন্যায়-সত্য, সধু-সজ্জন, মহাপুরুষ কিম্বা বন্ধু-বান্ধবকে উপলক্ষ্য করে ক্ষমা ও উপেক্ষা ধর্ম অনুশীলিত হয় না। ক্ষমা-উপেক্ষা-এগুলো একেকটা দশবিধ বোধি-চর্যার অন্যতম। অন্যায়, অবিচার, হিংসা, বিদ্বেষ, বিরোধ বিসম্বাদ পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রবল প্রভাব বিস্তার করে আছে। এসবের অসীম শক্তি। কার কী বা সাধ্য এই ভয়ঙ্কর শক্তিকে সর্বতোভাবে নিরসন কয়ে। এই অশুভ শক্তিকে জয় করিতে পারে কেবলমাত্র মৈত্রী, ক্ষমা ও উপেক্ষা।

কাজেই যেই অশুভশক্তি বা শত্রু ভাণ্ডার লোককে উপলক্ষ্য করে দুর্লভ বোধিচর্য্য সিদ্ধ হয়, যাকে বারবার ক্ষমা করতে করতে বহু জন্ম জন্মান্তরের প্রাক্তন অশুভ সংস্কার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভাবী অকুশল সংস্কারের পুনরোৎপন্ন অসম্ভব হয়, যা বৃদ্ধ প্রাপ্তির পরে ক্ষ হেতু অপরিহার্য কারণ, যাকে অবলম্বন করে এত বড় সৌভাগ্য লাভ হয়—তাকে শত্রু বলে কে? সে তো পরম বন্ধু, কল্যাণ মিত্র। শত্রু-রূপী এহেন পরম বন্ধুকে সর্বদা মৈত্রী-করণা, ক্ষমা ও উপেক্ষার সহিত সেবা করা পবিত্র কর্তব্য। তাকে বন্ধু আলিঙ্গন করা বিধি-সম্মত প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত বোধিসত্ত্বের চর্য্য সাধনায় উক্ত হয়েছে :—

যং কিঞ্চিৎ জগতো দুঃখং সর্বং তং ময়িপশ্যতাম্ ।

বোধিসত্ত্ব শুভৈঃ সর্বৈ জগৎ সুখি মন্তু চ ।

বোধিচর্য বতীর ।

জগতের যত সুখ-অশান্তি সবই আমার বৃকে আসুক আর আমার আত্মবন সাধনা-লব্ধ যদি কোন পুণ্য সংস্কার সঞ্চিত হয়ে থাকে— তবে সবই জগদ্বাসীর হিত সুখ সাধন করুক ।

অভ্যাখ্যাস্যন্তি মাং যে চ চা পো'পাপ কারিণঃ ।

উৎপ্রাসকা স্তথাপো'পি সবে সু'বোধি ভাগিণঃ ॥

“যাঁহারা আমারে কলঙ্ক দেন

যাহারা করেন ক্ষতি.

যাঁহারা হানেন বিন্দুপ বান

সতত আমার প্রতি ।

তাঁহাদের তরে জাগে প্রার্থনা

অন্তরে নিরবধি,

তাঁরা যেন পান তথাগত পদ

তাঁরা যেন পান বোধি ।”

তথাগত বুদ্ধের নীতি ধর্মে এদিক দিয়ে শত্রু স্বীকৃতি নেই। তাই বলে শত্রু নামে যে একেবারে কিছুই উল্লেখ নেই—এমন নহে। বৌদ্ধ ধর্মে শত্রু-স্বীকৃতির একটা রকমারি আছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধ ধর্ম মানুষের জীবনে প্রকৃত শত্রুব বিষয় বিশদভাবে নির্দেশ করেছে। সাধারণতঃ কুকুরকে তিল ছুঁড়লে কুকুর তিলকে রোখে, তিল নিক্ষেপকারীকে নহে। মানুষকে তিল নিক্ষেপ করলে মানুষ রোখে তিল নিক্ষেপকারীকে; তিলকে নহে। জানী পুরুষ নিক্ষেপকারীকেও নহে। জানী পুরুষের লক্ষ্য বস্তু হল,—যে ভূতের তাড়নায় তিল নিক্ষেপ করল—সে ভূত। সে সকলের শত্রু। ভূতাপ্রিত ব্যক্তি যত উপদ্রবই না করুক তার প্রতি কেউ রুষ্ট হয় না। বরং তার প্রতি সকলের অনুকম্পা জাগে যে কিরূপে তাকে ভূতের কবল থেকে উদ্ধার করা যায়? ভূতই সকলের শত্রু, ভূতাপ্রিত ব্যক্তি নহে। এ ভূত বিশ্ববাপী।

ক্লেশোন্নতী কৃতেষ্বেসু শ্রুতেষুচ যাতনে ।

ন কেবলং দয়া নাস্তি ক্রোধ উৎপদ্যতে কথং ॥

তা হলে কাম-ক্রোধাদি রূপ পিশাচ-দ্বারা আক্রান্ত যে ব্যক্তি উন্মত্ত হয়ে এভাবে পরাপকারাদি পাপাচরণ করে আত্মঘাতী হতে বসেছে। তার উপর দয়া না হলে ক্রোধ বা আক্রোশ জাগে কিরূপে? অগ্নির স্বভাব দগ্ধ করা—ইহা আমরা ভালরূপেই জানি; তাই অগ্নিতে

দগ্ধ হলেও অগ্নির উপর আমরা ক্রুদ্ধ হই না। সেরূপ যদি ধরা যায় যে মুখদের স্বভাব অপরের অনিষ্ট সাধন করা, তা হলে তাদের উপর ক্রোধ করা অযৌক্তিক। ‘যার স্বভাব যেই, সেই মত চলে সেই’। বৌদ্ধ ধর্ম শত্রুতা সম্পর্কে শুধু এরূপ যুক্তি, বিচার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বৌদ্ধ ধর্মের নীতি যে একটা উল্টো সত্যের সিদ্ধান্তে জগতকে অবাক করে তুলেছে। শত্রু ভাবাপন্ন লোকের শত্রুতাচরণকে উপলক্ষ্য করে ক্ষমা করতে করতে ‘সে সুখী হোক’ বলে বারবার শুভেচ্ছা পোষণ করতে করতে আমি হই বিরাট শক্তি ও সৌভাগ্যের অধিকারী, আমি হই স্বর্গবাসী, মোক্ষগামী আর শত্রু ভাবাপন্ন লোকটি আমার সাথে শত্রুতাচরণ করতে করতে সে হয় চরম দুর্ভাগ্যের অধিকারী, সে হয় নরকগামী। এখন বিচারে দেখা গেল, — সে আমার স্বর্গ-মোক্ষ গমনের উপলক্ষ্য আর আমি তার নরক গমনের উপলক্ষ্য। প্রত্যক্ষ কারণ না হলেও পরোক্ষ হেতু। সুতরাং আমি তার অপকারী, সে আমার পরম হিতৈষী। বোধিসত্ত্বের জীবনাদর্শের অনুসৃত কাব্য বর্ণনায় বাঙ্গালী কবি বলেছেন —

‘শত্রু কোথায় অনিষ্টকারী

কাহারে বলেছ তুমি।

আমি তো দেখেছি মিত্রে পূর্ণ

রয়েছে মতভূমি।

ক্রোধ জয়ী ওই ক্ষমা অনুপমা

যাহা আনি দেয় বোধি,

কেমনে লভিতে ক্রোধের কারণ

অরি না রহিত যদি।

লভিবারে যাহা করি প্রযত্ন

সতত সেবিয়া ধর্মে,

তাই দিল মোরে শত্রু আমার

আঘাত হানিয়া মর্মে ।
 ধর্মেরই মতো তিনিও পূজ্য
 করি বন্দনা তাঁর,
 শত্রুর বেশে বন্ধু আমার
 খোলে মুক্তির দ্বার ।’

এ জগতে সুখ শান্তি সকলেরই কাম্য । দুঃখ অশান্তি কেউ আকাঙ্ক্ষা করে না । কিন্তু কি করে সুখ শান্তি লাভ হয়, তার যথার্থ পদ্ধতি সকলের জানা থাকে না । ফলে দুঃখ অশান্তি থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেও মূঢ়তাবশতঃ নিজের সুখকে শত্রুর ন্যায় ধ্বংস করে । জগতের সর্বপ্রকার দুঃখ অশান্তি দূর করে জগতকে সকল সুখে সুখী করতে হলে কি ধর্ম ক্লেত্র, কি সংসার ক্লেত্র—এই মৈত্ৰী-ক্ৰমা ও উপেক্ষার আশ্রয় নিতে হবে । এ ছাড়া অন্য পথ নেই । পরলোক, স্বর্গ-মোক্ষ, নির্বাণতত্ত্ব দূরের কথা, এ সব গুণ ধর্ম ব্যতীত সংসার যে ভীষণ কোলাহল হয়ে দাঁড়ায় । সংসার গতি যে রুদ্ধ হয়ে যায় । জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ—এ সব জাগতিক দুঃখ কারো ব্যক্তিগত নহে । এ সব সকলের মধ্যে সমান, সকলের জীবনে এক ও অখণ্ড ।

যাহা অহং তথা এতে, যথা এতে তথা অহং.
 অভ্যনং উপমং কত্বা ন হনেম্য না ঘাতম্যে

সূক্ত-নিপাত ।

‘যেমন আমার প্রাণ তেমন তাদের,
 যেমন তাদের প্রাণ তেমন আমার ।
 তুলনার তরে নিজকে সম্মুখে রাখিও,
 অপরের প্রাণবধ কভু না করিও ।
 জরাকে রামের দুঃখ, ব্যাধিকে শ্যামের দুঃখ, মরণকে যদুর

দুঃখ, জীবনকে আমার জীবন—এভাবে বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে সকলের দুঃখকে এক অখণ্ড দুঃখ রূপে দর্শন করে প্রতিকার করতে হবে। আমরা কিন্তু নিজ নিজ খণ্ড খণ্ড সুখ-শান্তি আহরণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে একে অন্যকে দুঃখ দিয়ে প্রত্যেকেই বোর দুঃখ আহরণ করছি।

আমাদের এই দেহ যেমন নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত হলেও বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন; তেমনি দেশ, জাতি, ব্যক্তি বিশেষ নিয়ে বিভিন্ন প্রকার হলেও সুখ-দুঃখের বিচারে এ অঙ্গ এক ও অখণ্ড। কর, চরণ, মস্তকাদি নানা অঙ্গ ভেদে বহুরূপ বিশিষ্ট এই দেহকে যেমন একাত্ম বোধেই পালন করতে হয়, সমান সুখ-দুঃখান্বিত জীব জগতকেও সেরূপ একাত্ম বোধে দর্শন করতে হবে। কর, চরণ, মস্তকাদির সুখ-দুঃখ যেমন আমাদের নিকট ভিন্ন নহে—এক, সমগ্র জগতের সুখ-দুঃখ তেমনি আমাদের নিকট ভিন্ন নহে—এক। দেহের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ বাথিত হলে সমগ্র দেহ বাথা-যুক্ত হয়, এমন কি মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হয়; তদ্রূপ যে কোন ব্যক্তি সমাজ বা জাতির বাথায় সমান অনুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। এভাবে অখণ্ড দৃষ্টিতে জগৎকে দর্শন করলে তখন লক্ষ্য আসবে যে সর্বত্র যাতে সমান সুখ, সমান পুষ্টি, সমান শান্তি বিহিত হয়। কেবল মাত্র দেহের একটি অঙ্গ পুষ্টি লাভ করলে যেমন ইহা অনর্থের কারণ, বিপদের লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়, তেমনি কোন ব্যক্তি বিশেষ, জাতি বিশেষ কিম্বা দেশ বিশেষ উন্নতি করলে, পুষ্টি বা সমৃদ্ধি অন্যান্য সকলের মধ্যে বণ্টন করে না দিলে ইহা অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমি উন্নতি করেছি, সুখ-শান্তি মান-যশ লাভ করেছি—ভাল কথা। আমার এই সুখ-সম্পদ সকলের মধ্যে যদি ভাগ করে না দেই তবে আমার এই সুখ-সম্পদ গোদ রোগীর এক অঙ্গ বৃদ্ধির ন্যায় বিপজ্জনক হবে।

আমি উন্নতি করেছি বলে অপরকে যদি অনুন্নত মনে করি, তবে মান মত্ততায় কাপুরুষতার পরিচয়ই দেব। একান্ত স্বার্থ বুদ্ধিতেই যদি চলতে চাই, তথাপি সাম্য, মৈত্রী, ধৈর্য, ক্ষমা ছাড়া আমাদের অন্য গতি নেই। একমাত্র আমিই যদি বিদ্বান, ধনী, সৎ, স্বাস্থ্যবান হই, আমার পরিবারস্থ, বাড়ীস্থ, গ্রামস্থ সবাই যদি মূর্খ, নিধন, অসৎ ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তবে আমার অবস্থা কি দাঁড়াবে, সর্বদা মূর্খদের সংশ্বে তাদের মূর্খতাপূর্ণ প্রভাবে, চর্চার অভাবে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি, ধ্যান-জ্ঞান, সবই দৈনন্দিন লোপ পাবে। দীন-দরিদ্রের পাশ্চাত্য পড়ে আমার ধন রক্ষা করা যাবে না। সর্বদা চুরি করে জোর জবরদস্তি হবে। অসন্তের পরিশেষে আমার চরিত্র রক্ষায় অসমর্থ হব। পদে পদে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হবে। অসৎ লোক আমার পারিবারিক পবিত্রতানষ্ট করবে বহু রোগীর মাঝখানে আমি একজন স্বাস্থ্যবান, চতুর্দিকের নানারোগ-ধীরে ধীরে আমার জীবন বিপন্ন করে তুলবে। সুতরাং আমার স্বার্থের জন্যে হলেও আমার পরিবার, বাড়ী ও গ্রামের সকলকে বিদ্বান, সৎ, স্বাস্থ্যবান ও ধনে মানে উন্নত করে তুলতে হবে। আমার ন্যায় তাদেরকে সকল সম্পদে সুখে-স্বচ্ছন্দ্যে সমান করে নিতে হবে।

এরূপ কল্পনায় আমার পরিবার, আমার বাড়ী, আমার গ্রামকে সব বিষয়ে উন্নত করলাম। এখন সকলের সকল প্রয়োজন গ্রামের সীমায় সীমিত থাকবে না। চতুর্দিকের গ্রামগুলো নেহাৎ অনুন্নত। এগুলি যদি পূর্বাবস্থায় থাকে, তবে পূর্ব সমস্যাই তো রইলো। অতএব আমারই স্বার্থের খাতিরে জেলাসুদ্ধ সমস্ত লোকের বিদ্যা, ধন, মান, জ্ঞান স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজন। এভাবে ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি হবে যে জেলা নিয়েও সমস্যার সমাধান নেই। এই একমাত্র “আমি”র জন্যে জেলা হতে প্রদেশ, প্রদেশ হতে দেশ, দেশ হতে সমগ্র পৃথিবী পর্যন্ত টানতে হবে। এরূপে সমগ্র জগতের উন্নতি ও সুখ

স্বাচ্ছন্দ্যের উপর যখন আমার এই “আমি”র উন্নত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করছে তখন আমি যাকে “আমি” বলে অহঙ্কার করি কার্যতঃ তা অখণ্ড পৃথিবীর একটি অঙ্গ মাত্র। সমগ্রের উন্নতি ছাড়া একের উন্নতি অসম্ভব।

ক্ষান্তি ও উপেক্ষা—মৈত্রী সাধনার পরিপূরক

সংসারে মানবতার পরিপন্থী যত রকম অন্তর্ভুক্ত শক্তি আছে—ক্রোধ তাদের মধ্যে প্রধান। ক্রোধের আশুনে যাতে সংসারে দাবানল সৃষ্টি হতে না পারে, সেজন্য মানবতার সাধককে প্রযত্নে ক্ষান্তি বা ক্ষমা-শীলতা অনুসরণ করতে হয়। অপরে আমাকে যতই গালি-পালাজ দিক না কেন, তার প্রতি হিংসা গ্রহণে আমাকে বিরত থাকতে হবে। শুধু তাই নহে। তার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার অসদিচ্ছা বা প্রতিহিংসার ভাব পর্যন্ত পোষণ করতে পারবে না। এর নাম ক্ষান্তি।

কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে ‘ক্ষান্তি’ অভ্যাস করতে হবে সে সম্বন্ধে ভগবান তথাগত মৌলীফাল্গুন নামক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, যদি কেহ তোমার সম্মুখে তোমারই আত্মাতি মূলক কোন কথা বলে, তথাপি যা গৃহীজনোচিৎ দ্রব্ধ, যা গৃহীজনোচিৎ বিতর্ক তা পরিত্যাগ করবে এবং এরূপে শিক্ষা করবে। এতে তোমার চিত্ত বিকার প্রাপ্ত হবে না। কোন পাপ বাক্য উচ্চারণ করবে না। সর্ব প্রাণীর হিতানুকম্প হয়ে মৈত্রীতে দ্বেষ-ব্যবধানে অবস্থান করবে।

বোধিসত্ত্বকে ক্ষান্তি পারমিতা সাধনার জন্য এরূপ সংকল্প গ্রহণ করতে হয় :—

যথাপি পঠবী নাম সূচিম্পি অসূচিম্পি চ,

সক্বং সহতি নিক্খপং ন করোতি পটিপং দমং।

তথৈব ত্বম্পি সক্বং সম্মানাবমানন ক্খযো,

খন্টি পারমিতং গম্ভা সম্বোধিৎ পাপুনিঃসসি ।

বুদ্ধবংশ ২২৩—২৪ ,

যেমন পৃথিবীর উপর কেহ গুটি বা অগুটি যে কোন বস্তু নিক্ষেপ করলে পৃথিবী ভেঁপ্ৰতি দয়া বা ক্রোধ প্রদর্শন করে না, তদ্রূপ তুমিও যাবতীয় মান অপমান সহ্য করে ক্ষান্তি পারমিতা পূর্ণ করতে পারলে সম্বোধি লাভ করতে পারবে ।

আচার্য শান্তিদেব বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ক্ষান্তি পারমিতার সাধনা প্রণালী বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন । মানবতার সাধক কি ভাবে ক্রোধ, হিংসা—দ্বেষাদি জয় করে মৈত্রী সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারেন, তার কৌশল বর্ণিত হয়েছে ।

ন চ দ্বেষ সমং পাপং ন চ ক্ষান্তি সমং তপঃ ।

তস্মাৎ ক্ষান্তিং প্রযত্নেন ভাবয়েদ্ বিবিধৈনয়ৈঃ ॥

বোধিচর্যাবতার, ৬/২

দ্বেষের সমান পাপ নেই, এবং ক্রমার সমান তপস্যা নেই । অতএব পরম প্রযত্নে এবং নানা উপায়ে ক্রমাশীলতা অনুশীলন করবে ।

ক্ষান্তি ত্রিবিধ, যথা :—(ক) দুঃখাধি বাসনা ক্ষান্তি । (খ) পরাপকার মর্ষণ ক্ষান্তি এবং (গ) ধর্ম নিধান ক্ষান্তি ।

অত্যন্ত অনিষ্ট বা দুঃখের সৃষ্টি হলেও দৌর্মনস্য বা মানসিক অশান্তির উৎপত্তি যদি না হয়-তা'ই দুঃখাধি-বাসনা ক্ষান্তি । দৌর্মনস্য, ভাবের প্রতিপক্ষরূপে যত্ন পূর্বক 'মুদিতা' বা মনের প্রফুল্লতা অভ্যাস করতে হয় । সাধককে একরূপ বিচার করে দৌর্মনস্য দূর করতে হবে,—একেবারেই যা ইচ্ছা করিনা এমন দারুণ অনিষ্টও যদি কিছু আমার নিকট আসে, তথাপি আমার মুদিতা বা মানসিক প্রফুল্লতা ক্ষুদ্র হতে দেব না । কারণ প্রফুল্লতা নষ্ট করে দৌর্মনস্য আশ্রয় করলে আমার অভীষ্ট ফল লাভ হবে না । উপরন্তু যা কুশল তাও নষ্ট হবে । যদি অনিষ্ট প্রাপ্তি এবং ইষ্ট ব্যাঘাতের

ব্রহ্ম বিহার । ৬৩

প্রতিকারের উপায় থাকে, তা হলে দু'মনা হই কেন? ,প্রতিকারের চেষ্টা করব পুনরায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি প্রতি-কারের উপায় না থাকে, তা হলেই বা অনর্থক দু'মনা হয়ে কী হবে? আপন মনের প্রসন্নতা নষ্ট করলাম মাত্র।

(খ) পরাপকার মর্ষণ ক্ষান্তি বসতে অন্যের কৃত অপকার সহ্য করা এবং অপকারীর অনিষ্ট না করাই পরাপকার মর্ষণ ক্ষান্তি। কেহ অপকার করলেই স্বভাবতঃই তার উপর মানুষের ক্রোধ জন্মে এবং প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তি জন্মে। এরূপ ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবনা দ্বারা ক্রোধ দমন এবং পরের অনিষ্ট সাধনের প্রবৃত্তি জন্ম করা যায় আচার্য শান্তিদেব তা নির্দেশ করেছেন :—

মুখ্যং দণ্ডাদিকং হিত্বা প্রেরকে যদি কুপ্যতে ।

দ্বেষণে প্রেরিত সো'পি দ্বেষে দ্বেষোন্তু মে বরং ॥

বোধিচর্যাবতার, ৬/৪১

কেহ যখন দণ্ডাদি নিক্ষেপ করে আমাকে আঘাত করে, আমি দণ্ডাদির উপর ক্রুদ্ধ হই না। দণ্ডাদি যার দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয় তার উপর ক্রুদ্ধ হই। মুখ্য দণ্ডাদিকে ত্যাগ করে যদি আমি তার প্রেরকের উপর ক্রুদ্ধ হই, তবে দ্বেষের প্রতিই তো আমার বিদ্বেষ হওয়া উচিত। সে ... দণ্ডাদির প্রেরকও দ্বেষের দ্বারা প্রেরিত হয়ে থাকে।

মহা কৰ্ম্ম চোদিতা এব জাতা মহাপকারিণঃ ।

যেন যাসান্তি নরকান্যয়ে বাসো হতা ননু ॥

বোধিচর্যাবতার, ৬/৪৭

আমি তাদের অপকার করেছিলাম বলে আমার সেই পাপ কর্মের দ্বারা প্রেরিত হয়েই তারা অপকারী হয়ে জন্মেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে আমিই তাদের সর্বনাশ করলাম।

(গ) ধর্ম নিধান ক্ষান্তি—ধর্ম আগতিক পদার্থের স্বরূপ

চিন্তনের দ্বারাও ক্ষান্তি বা ক্ষমাশীলতার অনুশীলন করা যেতে পারে। যখন জগতের পদার্থ মাত্রই ক্ষনিক ও নিঃসার, তখন কার উপর ক্রোধ বা বিদ্বেষ করা যায়? সুতরাং ক্ষমাই জীবনের মূল-মন্ত্র। মন অমূর্ত তাকে কেউ আঘাত করতে পারে না। শরীরের প্রতি আসক্তি বশতঃই মন দেহের দুঃখে নিজ দুঃখ কল্পনা করে দুঃখিত হয়। ধিক্কার, কৰ্কশ বাক্য, অখ্যাতি ইত্যাদি দেহকে আঘাত করে না, মনকে তো করতেই পারে না। তবে, হে মন! কেন তুমি দুঃখিত হও। তুমি শত্রুর অনিষ্ট চাও, তার না হয় অনিষ্টই হলো, কিন্তু তোমার কী লাভ হলো? তাতে তোমার কী তৃপ্তি? আর তুমি ইচ্ছা করলেই কি তার অনিষ্ট হয়ে যাবে? না হয় ধরা যাক, তোমার ইচ্ছাতেই তার অনিষ্ট হয়ে গেল; কিন্তু তার দুঃখ হলে কি তোমার সুখ হবে? এরূপ হওয়াকে যদি স্বার্থ সিদ্ধি বল, — তবে অনর্থ সিদ্ধি কাকে বলবে?

এতদি বড়িশং ঘোরং ক্লেশ বাড়িশিকা পিতং।

যতো নরক পালা স্ভাং ক্রীড়া পক্ষান্তি কুন্তিষু।

বোধিচর্যাবতার : ৬/৮৯

মনে রেখ, এরূপ পরানিষ্ট চিন্তাই সেই ভয়ঙ্কর বড়িশ, যা ক্লেশ-রূপে বাড়িশিক (মৎস্য শিকারী) তোমাকে গাঁথবার জন্যই বড়িশ ফেলে রেখেছে। তুমি ধরা পড়লে, তার নিকট হতে নরক পালগণ তোমাকে ক্রয় করে কুন্তিপাকে পাক করবে।

এরূপ চিন্তন দ্বারা মন শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করবে। ব্যক্তি-গত ও সমষ্টিগত জীবন শান্তি অনুশীলন দ্বারা পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র-বিবাদ, শ্রেণী-সংঘর্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রশমিত হয়ে পড়ে। এরূপে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন,

খন্ত্যা ভিযো ন বিজ্জতি

সংস্কৃতনিকায় : ১/২২২

জগতে ক্ষান্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ আর নেই। নিখিল বিশ্বকে অভিন্ন জ্ঞান করে, করুণা বিগলিত হৃদয়ে জীব-জগতের সেবায় সতত নিরত থাকেন। অসহিষ্ণু আমি যদি নিজের দোষে শত্রু ভাবাপন্ন লোককে ক্ষমা না করি, তবে আমিই আমার পরম সৌভাগ্যের বিঘ্ন হলেম, পুণ্যের সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও পুণ্য অর্জন করলাম না।

মৈত্রী সাধনা পরাত্ম সমতা

ও

পরাত্ম পরিবর্তনে সক্ষম

আচার্য শান্তিদেব বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে মানবতা বিকাশের জন্য দু'টি ধ্যানের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, (ক) পরাত্ম সমতা ধ্যান অর্থাৎ পরকে ও নিজেকে সমান বা এক বলে ভাবনা করা এবং (খ) পরাত্ম পরিবর্তন ধ্যান অর্থাৎ পরকে নিজ নিজকে পর বলে ভাবনা করা।

পরাত্ম সমতা মাদৌ ভাবয়ে দেব মাদরাৎ ।

সম দুঃখ সুখাঃ সর্বে পালনীয়া ময়াত্ববৎ ॥

বোধিচর্যাবতার : ৮/৯০

“পরাত্ম সমতা ধ্যান” সম্পর্কে ভাবনার প্রণালী এরূপে বর্ণনা করেছেন—প্রথমতঃ পরম অভিনিবেশ সহকারে পরাত্ম সমতা বিষয়ে এ ভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমার সুখ-দুঃখ আমার মনে যে ভাবে উৎপন্ন করে অন্যের সুখ-দুঃখ তার মনে সেই ভাবেই সৃষ্টি করে। অতএব যখন সুখ-দুঃখ সকলেরই সমান, তখন সকলকে আমার নিজের ন্যায় রক্ষা করা উচিত। এরূপ ধ্যানের দ্বারা যখন সাধকের চিত্ত দক্ষতার সহিত ভাবিত হয়, তখন তিনি অতি সহজে

ও স্বাভাবিক ভাবে পরহিতার্থে যে কোন দুঃখ বরণ করতে সক্ষম হন।

এবং ভাবিত সন্তানাঃ পরদুঃখ সমপ্রিয়াঃ।

অবীচি মব গাহন্তে—হংসাঃ পদ্ম বনং যথা ॥

বোধিচর্যাবতার : ৮/১০৭

এরূপ পরাশ্রয় সমতা দ্বারা যাদের চিত্ত ভাবিত, অপরের দুঃখের জন্য নিজের সুখও তাদের নিকট দুঃখের ন্যায় প্রতীত হয়। হংস যেমন সানন্দে পদ্ম বনে প্রবেশ করে, তাঁরাও সেরূপ অন্যের দুঃখ দূরীকরণের জন্য সানন্দে অবীচি মহা নরকেও অবতরণ করতে পারেন।

“পরশ্রয় পরিবর্তন ধ্যানের” উদ্দেশ্য হলো নিজেকে পর বলে জান করতঃ স্বার্থ-বুদ্ধি বিসর্জন করা এবং পরকে আপন বলে গ্রহণ করে পরার্থ সেবায় আত্মনিয়োগ করা। এ ধ্যান কালে সাধককে এরূপ ভাবনা করতে হয়,—

নিজের এবং পরের উভয়ের দুঃখ দূর করার জন্য আমি আমার এই “আমি” কে অন্যের হস্তে দান করেছি এবং অন্যকে ‘আমি’র ন্যায় গ্রহণ করেছি। হে মন! ইহাই তোমার সিদ্ধান্ত হোক যে, সকলের মধ্যে তোমাকে ও তোমার মধ্যে অন্য সকলকে একাত্মরূপে গ্রহণ তোমার জীবনাদর্শ। সর্ব জীবের স্বার্থ ভিন্ন এখন তুমি আর অন্য কিছু চিন্তা করো না। যদি তুমি পরশ্রয় পরিবর্তন সাধনা পূর্ব থেকে করে আসতে তা হলে এরূপ দশা হত না। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সম্যক সুখ তোমার লাভ হত। এতদিন তুমি তোমাতে আমিত্ব আরোপ করে ছিলে, এখন থেকে অন্য জনে সেরূপ আমিত্ব আরোপ কর। অন্যজনকে তুমি ‘আমি’ বলে মনে কর। তোমার এই ‘তুমি’ কে সুখ হতে বিচূত কর। পর দুঃখের ভার গ্রহণ কর। নিকৃষ্ট দাসের ন্যায় নিজেকে জন-সেবায় খাটিয়ে লও। তোমার এই ‘তুমি’র জন্য অপরের যতসব

অপকার করেছ। অপরের উপকারের জন্য আজ সেই সমস্ত দুঃখ বিপদ তোমার ‘তুমি’র উপর চাপিয়ে দাও। হে চিত্ত! অতীতের দুঃখরাশির কথা চিন্তা করে আমি তোমাকে অনেক নিকট বিক্রম করেছি। প্রমাদ বশতঃ তোমাকে যদি আমি জীবগণকে না দেই, তা হলে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে তুমিই আমাকে নরক পালপণের হস্তে দান করবে। এভাবে বহবার তা’দের হস্তে আমাকে সমর্পন করে তুমি দীর্ঘকাল দুঃখ দিয়েছ। সেই শত্রুতার কথা চিন্তা করে ‘হে স্বার্থ দাস! আমি তোমার অস্তিত্ব ধ্বংস করব। যদি তোমার যথার্থই আত্মরক্ষা করতে চাও, তবে আত্মাকে রক্ষা করো না। জগতের আত্মহিতের জন্য আমি এই দেহকে নিরাসক্ত হয়ে দান করেছি। বহু দোষে দুষ্ট হলেও কর্মের বস্ত্র বা উপকরণ স্বরূপ একে আমি ধারণ করেছি।

আচার্য শান্তিদেব বলেন,—যিনি নিজের ও পরের সত্ত্ব পরি-
 ত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁর এই পরম ওহ্য পরাত্ম পরিবর্তন নীতি
 অভ্যাস করা উচিত। অভ্যাস বলে জগতে সব কিছু সম্ভব।
 সুতরাং পরাত্ম সমতা ও পরাত্ম পরিবর্তন সম্পর্কিত চিন্তাশীলতার
 প্রভাব, পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে ও একান্ত বোধের সৃষ্টি নীতিতে
 ইহা অসম্ভব নহে। অপরের প্রতি সক্রিয়ভাবে জেগে উঠলে নিজের
 তখন ঈর্ষাই জাগে, দিক্কার জাগে। এরূপে স্বার্থ বুদ্ধি বিসর্জন
 দেওয়া ও পরার্থ সেবায় আত্মনিয়োগ করায় এজগতে আত্মপর
 উভয়েরই সুখোৎসব সৃষ্টি হয়।

স্বপ্রাণানাং জগৎ প্রাপ্তে নদী নামিব সাগরৈঃ ।

অনন্তে যো ব্যতি করন্তদেবানন্ত জীবনম্ ॥

বোধিচর্যাবতার

অসীম সমুদ্রের সহিত নদী সমুদ্রের যেরূপ মিলন, জগতের অনন্ত
 প্রাণীর প্রাণের সহিত নিজের প্রাণের সেরূপ বাধাহীন ভেদ—রহিত যে

মহা-মিলন তা—ই অনন্ত জীবন।

ব্রহ্ম বিহার সাধনা অপরের সুখ দুঃখের সাথে নিজের সুখ-দুঃখ একত্বীভূত করে দেয়। সাধক অপরের সুখদুঃখে তন্ময় হয়ে আমিত্ব হতে মুক্ত হয়। তখন আমিত্ব ও দ্বৈত ভাব লোপ পায়। আত্ম-পর ভেদ জ্ঞান থাকে না। সাধকের চিত্ত যখন এরূপ সাধনায় সিদ্ধ হয়, তখন জাগতিক কোন অবস্থাতেই চিত্ত বিকৃত জন্মে না। নির্মল আকাশ তুল্য তাঁদের চিত্ত সর্ব ক্লেশ মুক্ত। এই বিশ্ব চরাচরকে স্থূল দৃষ্টিতে না দেখে অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সর্বশূন্য আকাশবৎ দর্শন করেন। এই জগৎটা যে মোহের বন্দন ও মিথ্যা দৃষ্টির উপকরণ ভিন্ন অন্য কিছু নয়—এই—ধারণা উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

মৈত্রী সাধনার ভিত্তিতে সর্বশুণ্যতা সমীক্ষণ বা প্রজ্ঞা লাভ

মৈত্রী করুণাদি ব্রহ্ম বিহার সাধনা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে সাধারণভাবে আত্ম-পর সমতা ও আত্ম-পর পরিবর্তনে পরিনত হলেও সমাধি ধ্যানের আলম্বন গ্রহণ না করলে, রূপারূপ সমাপতি লাভে ধ্যানপুষ্টি না হলে এসবের পূর্ণতা লাভ হয় না। স্থানিত্বের নিশ্চয়তা বিহিত হয় না কিম্বা ব্রহ্মলোক গমনের যোগ্য হয় না। মৈত্রী-করুণাদি সাধনার ভিত্তিতে সমাপতি লাভেই এর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

এরূপ সাধনার অতি উন্নত স্তরে গিয়ে পৌঁছলে যে মরণান্ত ঘটায় ও কিঞ্চিৎ মাত্র চিত্ত-বিকৃতি জন্মায়নি,—এরূপ সাধকের দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বিরল নহে। মহাযানপন্থী আচার্য আর্ষদেবের জীবন চরিতের একটা দৃষ্টান্ত এ ক্ষেত্রে বড় শ্রুতিমান যোগ্য,—

আচার্য আর্ষদেব ছিলেন শূন্যবাদপন্থী বৌদ্ধ-ভিক্ষু। দক্ষিণ

ভারতের কোন এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরমাচার্য শূন্যবাদী নাগার্জুনের সর্ব প্রধান শিষ্য আর্যদেব প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, বাগ্মীত্ব ও চরিত্রের মাধুর্যে তৎকালীন বৌদ্ধ-ভারতে অদ্বিতীয় ছিলেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে তাঁর জন্ম।

একবার দক্ষিণাত্যের এক রাজার উদ্যোগে আহত এক বিরাট বিচার সভায় শাস্ত্র যুদ্ধে তিনি অপরাপর পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরাস্ত করেন। ধ্বংসিত পণ্ডিতগণ বিচারের নিয়মানুযায়ী বৌদ্ধ শূন্যবাদ স্বীকার করে তাঁর শিষ্যত্বে দীক্ষা গ্রহণে বাধ্য হলেন। কিন্তু হায়! এই বিজয়ই অবশেষে তাঁর মৃত্যুর কারণ হলো। এই পরাজিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কোন এক পণ্ডিতের অতি উদ্ধত শিষ্য গুরুর পরাজয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আর্যদেবকে উদ্দেশ্য করে শপথ গ্রহণ করল এবং বলল—ভ্রাতার দ্বারা তুমি জয়ী হয়েছ, আমি জয়ী হবো কৃপাণের দ্বারা। এই বলে সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলো।

লোকালয় থেকে বহু দূরে নির্জন অরণ্যে আচার্য আর্যদেব শিষ্যগণ নিয়ে ধ্যান ও শাস্ত্র চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন। এই তপোবনেই তিনি তাঁর শত-শাস্ত্র ও চতুঃশতক নামক গ্রন্থরাজি রচনা করেন।

একদিন যখন তিনি তাঁর যোগাসন হতে উঠে ইতস্ততঃ পাল্লচারী করছিলেন, শিষ্যগণও যখন অন্যত্র ধ্যান-মগ্ন ছিলেন, তখন এই আততায়ী হঠাৎ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বলে উঠলেন, “শূন্য অস্ত্র দ্বারা তুমি আমাদের জয় করেছিলে, আজ প্রকৃত অস্ত্র দ্বারা আমি তোমাকে জয় করলাম”। এই বলে তৎক্ষণাৎ সে তাঁর উদরে অস্ত্রাঘাত করলো। দারুণ আঘাতে পাকস্থলী হতে অস্ত্রসমূহ বের হয়ে এল। তিনি ধরা শায়িত হলেন, রক্তস্রোত বইতে লাগিল। জীবন প্রদীপ নির্বাপনমুখ, তথাপি আর্যদেব প্রশান্তচিত্তে কল্পনা-

পূর্বক আততায়ীকে বললেন “বৎস, এই আমার কাষায় বস্ত্র ঐ আমার ভিক্ষা পাত্র, এইগুলো নিয়ে ভিক্ষুর বেশে অবিলম্বে এ পার্বত্য অঞ্চল থেকে পলায়ন করো। আমার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই এখনো অজ্ঞান। তারা তোমার উপর অত্যাচার করবে, তোমাকে বন্দী করে রাজ দরবারে প্রেরণ করবে। এখনো তোমার দেহের মায়া ত্যাগ করতে পারনি। দেহ-নাশের দুঃখ তুমি সহ্য করতে পারবে না। সুতরাং এখনই পলায়ন কর।

প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে, দেহত্যাগের আর বিলম্ব নেই এমন সময় তাঁর এক শিষ্য দৈবক্রমে তথায় এসে পড়লেন শিষ্যের করুণ চীৎকারে চতুর্দিক হতে শিষ্যবৃন্দ দ্রুতবেগে সেখানে উপস্থিত হলেন। চোখের সামনে তাঁদের প্রিয়তম আচার্যের এই শোকাবহ অবস্থা দেখে কেউ স্তম্ভিত, কেউ মুচ্ছিত, কেউবা উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন। আর কেউবা উন্নতব্য হত্যাকারীর সন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবমান হলেন। কে হত্যা করল, এই নৃশংস অত্যাচার করল কে? হত্যাকারী কোথায় গেল? অরণো; পর্বতে, দিকেদিকে এই প্রশ্ন মুহূর্মুহঃ ধ্বনিত হতে লাগল। তখন সেই মহারণ্য, সেই তাপসগণ অধ্যুষিত তপোবন-ভূমি সচকিত করে মুমূর্ষুর অবরুদ্ধ কণ্ঠ সহসা মুখর হয়ে উঠল,—

“নাহি প্রাণ, নাহি প্রাণী, নাহি হত্যা, নাহি অত্যাচার,
জন্ম নাহি, মৃত্যু নাহি, নাহি সুখ, দুঃখ হাহাকার।
কে তোমার প্রিয়জন, কার তরে কর অশ্রুপাত,
কে মারল, কে মরল, কে করল কারে অস্ত্রাঘাত।
হ্রিয় হোক মোহ বন্ধন, মিথ্যাদৃষ্টি হোক তিরোহিত,
মহা-ব্যোম-সমান শূণ্যতা শান্ত শিব প্রপঞ্চ অতীত।”

অস্ত্রবল, ধন-দাপট্য ও রাজশক্তির মাদকতা ক্ষুধিত অগ্নির মত গৃহ হতে গৃহান্তরে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে আপ-

নার লোভ ক্লেদাস্ত লেলিহান রসনাকে প্রেরণ করার জন্য অতিশয় বাগ্র—ইহা আমরা জানি। কিন্তু ইহাও ভালরূপে জানি যে, মৈত্রী করুণার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত মহান সম্রাট অশোক তাঁর অতুল-
নীয় রাজশক্তি ও সকল রাজকীর সম্পদকে ধর্ম বিস্তারে মানুষের
মঙ্গলবিধানে, জনসেবার নিযুক্ত করেছিলেন। তৃপ্তিহীন ভোগ-বাসনাকে
বিসর্জন দিয়ে শ্রান্তিহীন জীব-সেবার আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন।
মৈত্রী-করুণাদি তাঁর শুধু মুখের কথা, অভ্যস্ত নীতিকথা কিম্বা
শিলাগাঠে খোদিত লিপি রূপেই ছিল না; জীবনের কঠোর সাধনায়
চিরজাগ্রত পরম সত্যরূপেই রূপ নিয়েছিল। তদ্ব্যতীত চণ্ডাশোক পরিণামে
ধর্মাশোক রূপে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন।

আর, এই ব্রহ্ম বিহার বা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা
ধর্মের যিনি ছিলেন পূর্ণতা সাধক; তিনি ছিলেন অনন্ত জীবনের
অধিকারী; যিনি আপনার মহান অন্তরে বিশ্ব জগৎকে এবং বিশ্ব
জগতের মধ্যে আপনাকে অভিন্নরূপে দেখেছিলেন, তিনি করুণাঘন,
প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত, মহান শক্তিদয় তথাগত রূপে, মানবতার চরম
আদর্শরূপে শাস্ত্রত কাল পূজণীয়। তাঁর এই মহান শক্তি জাগতিক
সকল আবশ্যকের অতীত। অহেতুক, অপরিমেয়, পরিপূর্ণ মানবতার
অক্ষয় ভাণ্ডারে চিরকালের মত সঞ্চিত হয়ে থাকবে।

**সব্বো সস্তা ভবন্ত সুখিত'স্তা
জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক**

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২	ভূপ	ভূপ
"	"	সঙঝারাম	সঙঝারাম
"	"	রত্নোদধি	রত্নোদধি
৬	৭	অদ্রবেদী	অদ্রবেদী
১১	১০	আলোকচ্ছটা	আলোকচ্ছটা
"	৯১	মোহনী	মোহনী
"	১৭	লভ্য	লভ্য
১২	১৬	মাথ্য	মাত্য
"	১৭	এবামিস	এবামিস
"	২০	তিট্ঠিকরং	তিট্ঠিকরং
"	২১	অধিট্ঠেয়াং	অধিট্ঠেয়াং
১৩	২৮	দুঃখ	দুঃখ
"	২০	হতো	হলে
১৪	১২	সমস্থ	সমস্থ
১৬	৭	ইতস্তঃ	ইতস্তঃ
১৯	২০	ধর্মবিনয়	ধর্মবিনয়
"	১৮	কিংবা	কিন্তু
২০	৯	যীতকুলট	যীতকুলট
"	১৩	তদানুসারে	তদানুসারে
২১	৪	আমিষহারী	মিষাহারী
"	২৬	মন্ড	মৎসা
২৪	২৭	অভা	অভা
২৫	১৮	সস্তবপর	সস্তবপর
"	২৩	অভা	অভা...
২৬	৭	সমাধিক	সমাধিক
"	৮	সস্তাবনা	সস্তাবনা
"	১৬	পারে	পারেন
২৭	৫	গৃহস্থ	গৃহস্থ

পৃষ্ঠা	ছতর	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	৮	স্বাচ্ছন্দ্যের	স্বাচ্ছন্দ্যের
"	২২	প্রাধান্য	প্রাধান্যে
২৮	২৫	গার	গায়
৩১	১৭	সহিত	হিত
৩২	৯	বিজ্ঞান্য	বিজ্ঞান্যসন
"	২৫	-পুতুলের	পুতুল
৩৪	৮	গভীবর্জিতা	গভীবদ্ধতা
৩৬	২৬	অধিগগ	অধিগগ্ছে
"	"	সম্ভারুপসমং	সম্ভারুপসমং
৩৭	১৪	পবাস্ত	পটাস্ত
"	১৪	রুক্খতি	রুক্খতি
"	২৬	অসংমুহ্যে	অসংমুহ্যে
৩৮	৭	সান্ত্রের	সন্ত্রের
৩৯	৯	লোভ	লোক
৪১	৫	রোষোক্তি	রোষোক্তি
৪২	৯	দূর x	দূর করে
৪৩	২৬	মৈত্র	— — মৈত্রী
৪৪	২২	হিসাবে	অগতে
৪৫	৩২	মামগ্রক্রতা	সামগ্রক্রতা
৪৭	২৫	অপ্রজ্ঞাবান x	অপ্রজ্ঞাবান মাতা- পিতাকে
৪৮	১৯	মুখ্যতঃ	মুখ্যতঃ
"	১৬	ক্ষুদ্রচুপস	ক্ষুদ্রচুপম
৪৯	১৪	আনন্ডন	আনন্ডন
"	১৯	দন্ত	দন্ত
"	২৪	ব্যক্তি	ব্যক্তি
৫০	১২	মনোরম	মনোরথ
৫১	৬	ব্যপকাষে	ব্যপকাণ্টে
৫২	১৮	যাহা	যথা
৬২	২৪	পটিল	পটিল

পৃষ্ঠা	ছতর	অঙ্ক	শুঙ্ক
৬৩	২৪	কুশদ	কুশদ
৬৪	৫	মর্শন	মর্শন
৬৬	২১	ভাবে	ভাবে
৬৮	১০	আশ্ব-হিতের	হিতের
,	১১	বহু	যত্ন
"	১৪	আকাঙ্ক্ষা	আকাঙ্ক্ষা
৬৯	৬	বিকৃত	বিকৃতি
৭০	২	বন্দন	বন্দন
"	১৭	কিন্মা	কিংবা
৭০	২০	এই	এক
"	৩	বাগ্মীভায়	বাগ্মীভায়
৭১	১৩	উন্নতব্য	উন্নত বৎ
৭২	৪	রাজকীয়	রাজকীয়
"	৫	জনসেবার	জনসেবার
"	১২	তিনি	যিনি
"	১৬	তার	তীর

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Land of
Limitless Light!

The Vows of Samantabhadra

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in his Land of Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra

DEDICATION OF MERIT



May the merit and virtues
accrued from this work,
Adorn the Buddha's Pure Land,
Repaying the four kinds
of kindness above,
and relieving the sufferings of
those in the Three Paths below.

May those who see and hear of this,
All bring forth the heart of
Understanding,
And live the Teachings for
the rest of this life,
Then be born together in
The Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amitabha Buddha!

NAMO AMITABHA

Distributed by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org.tw

<http://web.singnet.com.sg/~amtbabss> ; <http://www.amtb.org.tw> ;

<http://www.amtb-usa.org>.

This book is for free distribution, not to be sold.

(If you need Buddhist books, please contact the CBBEF)

Printed in Taiwan

1998 October